বাংলার মহাপুরুষ

(শ্রীঅরবিন্দ)

পশুপতি ভট্টাচার্য

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
১০নং বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

প্রকাশকের নিবেদন

ইচ্ছা হয়েছিল যে স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের জন্য জগতের গুরু শ্রীঅরবিন্দের একটি ছোটো জীবনীপুস্তক প্রকাশ করব। তাঁর সম্বন্ধে আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের কিছু জেনে রাখা দরকার। ইনি যে একাধারে ভারতের স্বাধীনতার অগ্রদূত, পৃথিবীর সকলের চেয়ে বড়ো রাজনীতিজ্ঞ, ইনি যে সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কবি, আবার ইনি যে মহা দার্শনিক, বহুভাষাবিদ্, সর্বোৎকৃষ্ট সাংবাদিক, সর্বোচ্চ ধরনের সাহিত্যিক ছিলেন, তা আমাদের দেশের শিক্ষার্থীদেরই বিশেষ ক'রে জানা দরকার। ছেলেবেলাতেই যে কত জিনিস শেখা যায়, অল্প বয়সেই কত রকমের জ্ঞান অর্জন করা যায়, তার পরে ক্রমশই জীবনে যে কতখানি পর্যন্ত উন্নতি করা যায়, তা শ্রীঅরবিন্দের জীবনী থেকেই বুঝতে পারা যাবে। স্বাধীন ভারতের ছেলেমেয়েদের চোখের সামনে এই মহাপুরুষের আদর্শ আমাদের তুলে ধরা উচিত। সেই কারণেই এই বইখানি রচিত হয়েছে। এখন যদি এই বইখানি তাদের সকলের মধ্যে প্রচারিত হয় তাহ'লে শ্রীঅরবিন্দের ভবিষ্যদ্বাণী সহজেই সফল হতে পারবে এবং আমাদের পরিশ্রমও সার্থক হবে।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
প্রকাশক

এই বইখানি লেখার প্রারম্ভে মা পাঠিয়েছিলেন তাঁর আশীর্বাদ। আমাদের দেশের নবীন যুগের পাঠকপাঠিকাদের সঙ্গে তাই এখন বণ্টন ক'রে নিলাম। আশা করি এতে আমাদের সকলেরই অন্তর্দৃষ্টি এখনকার চেয়ে আরও কিছু বাড়বে, আমাদের আভ্যন্তরীণ চেতনা আরও কিছু খুলবে।

সূচী

প্রথম অঙ্ক

বাল্যপর্ব (সাত বছর)

দ্বিতীয় অঙ্ক

বিলাতপর্ব (চৌদ্দ বছর)

তৃতীয় অঙ্ক

বরোদাপর্ব (তের বছর)

প্রথম অঙ্ক

বাল্যপর্ব (সাত বছর)

প্রস্তাবনা

আমরা এখানে সেই বিরাট মহাপুরুষের কথা বলছি যিনি এই বাংলাদেশে বাঙালী হয়ে জন্মেও এখন আর কেবল বাংলার নয়, কিন্তু ভারতের, এশিয়ার, ও তথা সমগ্র জগতের সকল দেশের জ্ঞানী-গুণী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের কাছে বরেণ্য ও চিরস্মরণীয় হয়েছেন। সেই মহাপুরুষের শিক্ষা ও আদর্শ এখন সকল দেশেই সমাদরে স্বীকৃত হতে দেখা যাচ্ছে। বাংলার সেই মহাপুরুষ এখন সারা জগতের বন্দিত মহাপুরুষ।

এই বাংলাদেশের রাজধানী কলকাতা শহরে কে এমন মহাপুরুষ জন্মেছিলেন, যিনি গোড়া থেকে শেষ পর্যন্তই রয়ে গেলেন সকল জগতের সকল মানুষের জন্য সর্বত্যাগী? বাঙালীদের মধ্যে কে এমন জন্মেছিলেন যিনি আমাদের মতো রক্ত-মাংসের মানুষ হয়েও সকল রকমে মহাত্যাগী মহাদেবের অবতার স্বরূপ? কে তিনি, যিনি ভগীরথের মতো ভারতে এসেই এখানকার বহু বহু শতাব্দীর পরাধীনতার রুক্ষ মরুবক্ষে স্বাধীনতার মন্দাকিনীর প্রথম ধারাটি বহিয়ে দিলেন? কে তিনি, যিনি এই মর্ত্যের অন্ধকারে স্বর্গের দিব্য আলো নামিয়ে আনতে চাইলেন, এবং তা যে সম্ভব তারও বাস্তব দৃষ্টান্ত জগৎকে দেখিয়ে দিলেন ?

ইনি স্বনামধন্য ও জগৎবরেণ্য শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, যিনি এখন জগতের কাছে "শ্রীঅরবিন্দ" নামে পরিচিত ।

বাংলা মায়ের গর্ভে এর আগে এমন সর্বোজ্জ্বল কোহিনুর আর বুঝি একটিও জন্মায়নি। এঁর জীবনের কাহিনী কখনো পুরোপুরি ভাবে বলা সম্ভব নয়। সেই অসাধ্য সাধনের চেষ্টা না ক'রে সংক্ষেপে যতটুকু বলা সম্ভব ততটুকুই এখানে বলব। এ কাহিনী প্রত্যেক বাঙালীর অবশ্যই জানা উচিত।

কাহিনী শুরু করবার আগে প্রথমেই বলে রাখি এঁর চরিত্রের দুটি প্রধান বিশেষত্বের কথা। তা না ব'লে রাখলে মাঝে মাঝে গোলমাল ঠেকতে পারে। এই দুটি বিশেষত্বকে তিনি গোড়া থেকেই নিজের জীবনে বজায় রেখে গেছেন। প্রথম কথা, এগার বছর মাত্র বয়সেই তিনি স্পষ্ট অনুভব করতে পারলেন যে, জগতের কোনো একটা বড়ো কাজ করতে তিনি জন্মেছেন। দ্বিতীয় কথা, তের বছর মাত্র বয়সে তিনি বুঝে নিলেন যে, স্বার্থ জিনিসটাকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়ে তাঁকে চলতে হবে। তিনি যা কিছু করবেন তা নিজের ভালোর জন্য বা নিজের সুবিধার জন্য নয়, তাঁর সব কিছু কাজই হবে জগতের সকলের জন্য। বলতে গেলে প্রথম জ্ঞানোন্মেষের সময় থেকেই এই দুটি ভাব তাঁর মনে বদ্ধমূল হয়ে রইল। অতএব সেই বাল্যকাল থেকেই তাঁর টাকা উপার্জন ক'রে বড়োলোক হবার লোভ নেই, রাজা উজীর হয়ে নাম কেনবার কোনো উচ্চাশা নেই, আর এদিকে প্রাণের ভয় বলেও কিছুমাত্র নেই,—কেবল মনে মনে এইটুকু জানেন যে, তিনি এমন কিছু করবেন যা সাধারণের থেকে স্বতন্ত্র। সম্পূর্ণ স্বার্থশূন্য হয়ে তিনি এমন কিছু কাজ শুরু করবেন যা এর আগে কেউ কখনো করেনি।

এমন একজন মানুষের জীবন কাহিনী আগাগোড়া অ্যাড্‌ভেঞ্চারে

ভরা হবেই। তাই প্রকৃতপক্ষে এ কাহিনী রূপকথার চেয়েও রোমাঞ্চকর। এর মধ্যে এমন অনেক কথাই মিলবে যা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হবে না, কিন্তু তাহলেও আগাগোড়া এর সব কথাই খাঁটী সত্য।

জন্ম

শ্রীঅরবিন্দ জন্মগ্রহণ করেন কলকাতা শহরে ১৮৭২ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে। এই তারিখটি আমাদের বিশেষ করেই স্মরণীয়। এই তারিখে জন্মে তিনিই প্রথম ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা পাবার দাবির কথা উচ্চারণ করেছিলেন, এবং তাঁর জন্মের পঁচাত্তর বছর পরে ঠিক এই তারিখেই ভারত বাস্তবিকই স্বাধীন হয়েছিল। এমন অদ্ভুত যোগাযোগ জগতে প্রায় দেখা যায় না। এই তারিখটি ভারত-বাসীর কাছে দুই দিক থেকেই অমর হয়ে থাকবে। প্রতি বছরের এই তারিখে ঘরে ঘরে দীপান্বিতা উৎসবে ভারতবাসী পরম শ্রদ্ধায় একসঙ্গেই স্মরণ করবে যে, এই দিনেই হয়েছিল ভারতের স্বাধীনতার অভ্যুদয়, আর এই দিনেই হয়েছিল স্বাধীনতার অগ্রদূত শ্রীঅরবিন্দের অভ্যুদয়।

পিতামাতা

শ্রীঅরবিন্দের পিতা ছিলেন কলকাতার নিকটবর্তী কোন্নগর অঞ্চলের প্রাচীন ঘোষবংশের কৃতী সন্তান শ্রীকৃষ্ণধন ঘোষ, লোকে বলত ডাক্তার কে. ডি. ঘোষ। আর মাতা ছিলেন কলকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের অন্যতম নেতা শ্রীরাজনারায়ণ বসুর কন্যা শ্রীমতী স্বর্ণলতা।

কিন্তু এই দুজনের প্রকৃতি ও শিক্ষাদীক্ষা ছিল সম্পূর্ণই বিভিন্ন রকমের।

কৃষ্ণধন হলেন একজন বিলাতফেরত ডাক্তার। ডাক্তারি পড়তে এদেশ থেকে প্রথমে যাঁরা বিলাতে যান তিনি ছিলেন তাঁদেরই মধ্যে একজন। এবার্ডিন থেকে এম্. ডি. পাস ক'রে এখানে এসে তিনি সিভিল সার্জনের পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। বিলাতে বাস ক'রে আর বিলাতী শিক্ষা পেয়ে তাঁর মনে এই একটা বদ্ধমূল ধারণা জন্মেছিল যে, ইউরোপের শিক্ষা-দীক্ষা এবং সব কিছুই অতি উৎকৃষ্ট, তার তুলনায় ভারতের শিক্ষা প্রভৃতি সব কিছুই অতি নিকৃষ্ট। তাই বলে দেশকে বা দেশের মানুষকে যে তিনি ঘৃণা করতেন সেকথা নয়, বরং দেশের মানুষদের তিনি খুব বেশি ভালোই বাসতেন, আর দেশের লোকের প্রতি তাঁর প্রকৃতই খুব মমতা ছিল। তিনি ছিলেন উদার প্রকৃতির দেশহিতৈষী ও লোকহিতৈষী। গরিবদের তিনি বিনা পারিশ্রমিকে চিকিৎসা করতেন আর প্রচুর অর্থসাহায্য করতেন, এমন কি পকেট খালি ক'রে তাঁর যথাসর্বস্ব দান করতেও দ্বিধা হ'ত না। এই কারণে লোকে তাঁর নাম রটিয়েছিল খুলনার 'দাতাকর্ণ', কারণ বেশির ভাগ সময়ে খুলনাতেই ছিলেন তিনি সিভিল সার্জন। তথাপি দেশের চালচলন ও শিক্ষাদীক্ষার প্রতি তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিমুখ। তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, প্রকৃত মানুষ হ'তে হ'লে ইউরোপীয়দের মতোই হওয়া উচিত, সকল বিষয়ে ওদের আদর্শের অনুকরণ ক'রেই চলা উচিত। নিজেও তিনি সেই আদর্শ অনুসারেই চলতেন, তাই আচার-ব্যবহারে ছিলেন খাঁটী বিলাতী, এমন কি বাংলা ভাষাটাও

মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতেন না। চাকরদের সঙ্গে পর্যন্ত কথা বলতেন ইংরেজীতে নতুবা হিন্দীতে, বাংলায় নয়। এতই 'সাহেব' ছিলেন তিনি।

এদিকে স্বর্ণলতা ছিলেন সম্পূর্ণ অন্য প্রকৃতির। শ্রীরাজনারায়ণ বসু ছিলেন পরম জ্ঞানী ও ঈশ্বরভক্ত, বেদান্ত এবং উপনিষদে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য। দেশকে ও দেশের ধর্মকে তিনি সত্যই ভালো-বাসতেন, দেশসেবাই তাঁর জীবনের একটা ব্রত ছিল, এমন কি দেশোদ্ধারের উদ্দেশে তিনি ইতিপূর্বে গোপন সমিতিরও আয়োজন করেছিলেন। কন্যাকেও ইনি সেই ভাবেই শিক্ষিত করেন। স্বর্ণলতা তখনকার প্রগতিশীল শিক্ষিতা নারী ছিলেন, সাহিত্যে ও কাব্যে তাঁর বেশ দখল ছিল। কিন্তু স্বামীর সংসারে এসে তাঁকে স্বামীর মতেই চলতে বাধ্য হ'তে হয়। অতঃপর কোনো দৈহিক ও মানসিক বিপর্যয়ে সন্তানাদি হবার পর থেকে তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পায়। মাঝে মাঝে তিনি মূর্চ্ছা রোগে আক্রান্ত হতেন। কাজেই আপন সন্তানদের লালন-পালন করবার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। কখনো বা সন্তানদের তিনি বিনা কারণে বা সামান্য কারণে বেদম প্রহার করতেন। অবশেষে তাঁর উন্মাদের লক্ষণগুলি আরো বেশি বেড়ে যায়, তখন তাঁকে স্থানান্তরিত ক'রে রাখতে হয়। শ্রীঅরবিন্দ যখন বিলাত থেকে ফিরে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যান তখন নিজের ছেলেকে তিনি চিনলেনই না।

শ্রীঅরবিন্দ এঁদের তৃতীয় পুত্র। প্রথম পুত্র বিনয়ভূষণ, দ্বিতীয় পুত্র মনোমোহন। শ্রীঅরবিন্দের পরে জন্মেছিলেন তাঁদের ভগ্নী সরোজিনী। শেষে জন্মালেন কনিষ্ঠ পুত্র বারীন্দ্রকুমার। কৃষ্ণধন

যখন সপরিবারে পুনরায় বিলাতে যান তখন সেখানেই বারীন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন।

শ্রীঅরবিন্দের জন্মের পরে তিন ভাই-এরই মায়ের সঙ্গে বিশেষ কোনো সম্পর্ক রইল না। কৃষ্ণধন তাঁর প্রথম দুই পুত্রের শিক্ষা-দীক্ষার জন্য এক ইংরেজ শিক্ষক নিযুক্ত করলেন, আর শ্রীঅরবিন্দের লালন-পালনের ভার দিলেন এক ইংরেজ আয়ার হাতে। মাতৃস্নেহে ও মাতৃস্তন্যে বঞ্চিত হয়ে তাই গোড়া থেকে তিনি আয়ার কাছেই মানুষ হতে থাকলেন।

বাল্যশিক্ষার ব্যবস্থা

পাঁচ বছর বয়স হবার পর থেকে শ্রীঅরবিন্দকে এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ দুই ভাইকে কৃষ্ণধন আর তাঁর নিজের কাছে রাখলেন না। এঁদের তিন ভাইকেই তিনি পাঠিয়ে দিলেন দার্জিলিংএ আইরিশ নান্‌দিগের দ্বারা পরিচালিত লোরেটো কন্‌ভেণ্ট স্কুলের বোর্ডিংএ, যাতে তখন থেকেই ইউরোপীয় ছেলেদের সঙ্গে থেকে সম্পূর্ণভাবে তাদের মতো ক'রেই এঁরা মানুষ হতে পারেন। তাদের মতোই এঁদের বেশভূষা করতে হ'ত, তাদের মতোই সব কিছু চালচলন শিখতে হ'ত। দুই বছর কাল এঁরা সেখানেই রইলেন। শীতের লম্বা ছুটির সময় যখন এঁরা দার্জিলিং থেকে ফিরতেন তখনও পিতামাতার সঙ্গে কচিৎ সাক্ষাৎ হ'ত, এঁরা প্রায়ই দাদামশাইএর কাছে গিয়ে থাকতেন। কাজেই গোড়া থেকে ইংরেজী আর হিন্দী ছাড়া শ্রীঅরবিন্দ বাংলা কথা বলতেই জানতেন না। কে তাঁকে বাংলা বলতে তখন শেখাবে?

খুব অল্প বয়স থেকেই শ্রীঅরবিন্দ পিতামাতার কাছ ছাড়া হয়ে থেকেছেন। মাতৃস্নেহের ও মাতৃভাষার মিষ্ট আস্বাদ আদৌ তিনি পাননি। এই কথাটাই এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হয়তো নিজের মাকে পাননি বলেই পরে তিনি দেশমাতাকে ও জগজ্জননী মাকে এতটা ভালো ক'রে চিনেছিলেন।

দ্বিতীয় অঙ্ক

বিলাতপর্ব (চৌদ্দ বছর)

ম্যান্‌চেষ্টারে ড্রুয়েট পরিবারে

শ্রীঅরবিন্দের বয়স যখন সাত, তখন থেকেই তিনি দেশছাড়া হলেন। ঐ সময় কৃষ্ণধন ছেলেমেয়েদের নিয়ে সপরিবারে বিলাতে গিয়ে ম্যান্‌চেষ্টারে রইলেন। উদ্দেশ্য এই যে, সেখানেই তিনি ডাক্তারি করতে থাকবেন, স্ত্রীর মস্তিষ্কব্যাধির চিকিৎসা করাবেন, আর তিনটি ছেলেকে কোথাও রেখে উচ্চশিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করবেন। ছেলেদের তিনি সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ ধরনের ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করবেন, এই ছিল তাঁর একটা আন্তরিক ইচ্ছা।

ম্যান্‌চেষ্টারে ড্রুয়েট নামক একজন পাদ্রী এবং তাঁর স্ত্রীর তত্ত্বাবধানে ছেলে তিনটিকে তিনি তাঁদের কাছেই রেখে দিলেন। বড়ো তুজনকে সেখানকার স্কুলে ভর্তি ক'রে দেওয়া হলো, আর বাড়িতে রেখেই শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষার ভার নিলেন ওঁরা তুই স্বামী-স্ত্রী। ড্রুয়েট ছিলেন ল্যাটিন ভাষাতে পরম পণ্ডিত, তিনি গোড়া থেকেই শ্রীঅরবিন্দকে ল্যাটিন শেখাতে লাগলেন, আর তাঁর স্ত্রী শেখাতে লাগলেন ইংরেজী। কৃষ্ণধন বিশেষ ক'রেই সতর্ক ক'রে দিয়েছিলেন যে, তাঁর ছেলেদের কিছুতেই যেন কোনো ভারতীয়ের সংস্পর্শে আসতে দেওয়া না হয়, তারা যেন খাঁটী বিলাতী আবহাওয়ার মধ্যে থেকে সকল বিষয়ে ইংরেজের ছেলেদের মতোই মানুষ হয়।

ড্রুয়েটরা ঠিক সেই ব্যবস্থাই করেছিলেন। দেশের মাটি ও দেশের মানুষের সংস্পর্শমাত্র থেকে বর্জিত হয়ে সেই সাত বছর বয়স থেকে শ্রীঅরবিন্দ খাঁটী ইংরেজের ছেলের মতো মানুষ হ'তে থাকলেন। এটা অবশ্যই একজন বাঙালীর ছেলের পক্ষে অসাধারণ পরিস্থিতি। কিন্তু তেমন পরিস্থিতির মধ্যেই তাঁর অসাধারণ দীপ্তি বেরিয়ে পড়ল।

সাত বছর বয়স থেকেই শ্রীঅরবিন্দের আশ্চর্য প্রতিভার উন্মেষ হ'তে দেখা গেল। তাঁকে যখনই যা কিছু শেখাতে যাওয়া হয়, তিনি তৎক্ষণাৎ অতি সহজে তাই শিখে ফেলেন। দুর্বোধ্য ল্যাটিন ভাষাই বল আর খাঁটী ইংরেজী ভাষাই বল, কোনো কিছুতে তাঁর আটকায় না। আর শুধু যে শিখে ফেলা তাই নয়, ঐ দুটি ভাষায় আশ্চর্য দখল এনে আশ্চর্য রকমের কৃতিত্বের নিদর্শন দেখানো। দশ বছর বয়স থেকেই তিনি ল্যাটিনে ও ইংরেজীতে ভালো ভালো কবিতা লিখতে শুরু ক'রে দিলেন। অথচ এদিকে তিনি নিজের জামার বোতামটা পর্যন্ত আঁটতে পারেন না, নেকটাইটা বাঁধতে পারেন না। খেলাধূলা দুষ্টামি নষ্টামি কিছুই তাঁর নেই, বাড়ি থেকে বাইরে বেরোতে চান না, কারো সঙ্গে মেশেন না, কেবল নিজের ঘরের কোণটিতে বসে নানারকম বই নিয়ে পড়াশোনা করতে থাকেন। এর মধ্যেই দেখা গেল যে, তিনি বাইবেল ও শেক্সপিয়র প্রভৃতি বড়ো বড়ো বইগুলো পড়ে শেষ ক'রে ফেলেছেন। শুধু পড়া নয়, দেখা গেল যে, একবার যা পড়েন তা তিনি আর ভোলেন না। ছেলেটিকে শ্রীমতী ড্রুয়েটের ভারী পছন্দ হয়েছিল, তিনি এঁকে ক্রিশ্চান ক'রে নিতেও চেয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত তা অবশ্য ঘটে ওঠেনি।

পাঁচ বছর যাবৎ তিনি ছিলেন ড্রুয়েটদের সঙ্গে। এর মধ্যে তিনি অনেক কিছু শিখলেন, সাধারণের চেয়ে অনেক বেশি জ্ঞানসঞ্চার হ'ল। তার কারণ তিনি কেবল বই নিয়েই থাকতেন, আর মাঝে মাঝে নিজের মধ্যে তলিয়ে যেতেন। এগার বছর বয়সে তাঁর মনের মধ্যে এই এক অনুভূতি এল যে, সারা জগতের মধ্যে এক নতুন রকমের ওলট্-পালট্ আসন্ন হয়ে উঠেছে, এবং তাতে ওঁকে বিশেষ কোনো অংশ গ্রহণ করতে হবে। ওঁর মনে হ'ত যে, এখন থেকেই তার জন্য প্রস্তুত হওয়া চাই।

ইতিমধ্যে বিলাতে থেকে নিজের কাজের কোনো সুবিধা না হওয়াতে তাঁর বাবা আবার সপরিবারে দেশে ফিরে গেছেন, ওঁদের তিন ভাইকে বিলাতেই রেখে। পাঁচ বছর পর যখন ড্রুয়েটদেরও অন্যত্র চলে যেতে হ'ল, তখন তিন ভাইকে তাঁরা লণ্ডনে স্থানান্তরিত করলেন।

লণ্ডন স্কুলে

তের বছর বয়সে শ্রীঅরবিন্দ লণ্ডনে গিয়ে সেণ্ট পল্‌স স্কুলে ভর্তি হলেন। সেই স্কুলের হেডমাস্টার দেখলেন ল্যাটিন ও ইংরেজী ভাষাতে ছেলেটির অসাধারণ দক্ষতা। তিনি নিজে ছিলেন গ্রীক ভাষায় পণ্ডিত, তাই যত্ন ক'রে শ্রীঅরবিন্দকে তিনি গ্রীক ভাষাও শেখাতে লাগলেন। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি এ ভাষাটিও এমন আয়ত্ত ক'রে ফেললেন যে, শিক্ষকেরা বাধ্য হয়ে তাঁকে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই তাড়াতাড়ি উঁচু ক্লাসে উঠিয়ে দিতে থাকলেন। এর উপরে আবার তিনি নতুন ক'রে ফরাসী ভাষাটাও শিখে নিলেন। তখন তিনি ঐ বয়সেই চারটি বিদেশী ভাষায় সমান সুপটু হয়ে উঠলেন।

নতুন নতুন ভাষা শিখতে তাঁর আগ্রহের সীমা নেই, যে ভাষাই ধরেন অল্পদিনেই তা রপ্ত ক'রে নেন। ইংরেজী, ল্যাটিন, গ্রীক ও ফরাসী ছাড়া অতঃপর তিনি ইটালিয়ান, জার্মান ও স্প্যানিশ ভাষাও কিছু কিছু শিখে ফেললেন। এইভাবে ইউরোপের সাতটি ভাষাই আয়ত্তের মধ্যে এসে গেল। অথচ তাঁর বয়স তখন মাত্র চৌদ্দ বছর। একেই বলে অসাধারণ প্রতিভা।

ঐ সময় তিনি ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষার কবিতা রচনায় স্কুলের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন, এবং পরীক্ষাতে সকল বিষয়েই প্রথম হয়ে স্কুলের সমস্ত প্রাইজগুলি সে বছরে একাই অধিকার ক'রে নেন। অবশেষে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে তাতেও প্রথম স্থান অধিকার ক'রে তিনি প্রবেশিকার বিশেষ বৃত্তি লাভ করেছিলেন।

অথচ পাঠ্য বিষয়গুলি নিয়েই যে তিনি দিনরাত পরিশ্রম করতেন তা মোটেই নয়। পাঠ্য বিষয়ে তিনি বিশেষ মনোযোগই দিতেন না, বরং অন্যান্য বিষয়ের যত কিছু বই পেতেন সেইগুলোই অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে পড়তেন। এইভাবে তখন ইউরোপীয় মনীষীদের লেখা যত কিছু বিখ্যাত বই আছে, একে একে সমস্তই তিনি পড়ে ফেললেন। নানা ভাষার ভালো ভালো যত কাব্য, সাহিত্য ও ইতিহাস, কিছুই তাঁর কাছে বাদ গেল না। এই ধরনের বাইরের বই পড়া নিয়েই তিনি সকল সময় লেগে থাকতেন।

দারিদ্র্যের পীড়ন

কিন্তু লণ্ডনে থাকতে এক সময়ে পুরো একটি বছর তাঁকে অর্থের অভাবে নানা দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল। কথাটা শুনতে খুবই

আশ্চর্যের বটে, কিন্তু ব্যাপারটা হ'ল এই যে, দেশে ফিরে গিয়ে তাঁদের পিতা নিয়মিতভাবে তাঁদের খরচের টাকা পাঠাতে পারতেন না। সংসারে খরচ ক'রে ও দানখয়রাৎ ক'রে তিনি নিজেই এমন দেউলে হয়ে পড়লেন যে, একটি বছর ধরে বিদেশে ছেলেদের কাছে কিছুই পাঠাতে পারলেন না। সেই নির্বান্ধব স্থানে তিনটি ভাইকে তাই তখন মহা বিপদে পড়তে হয়েছিল। বাধ্য হয়ে বিনয়ভূষণ লণ্ডনের কোনো ক্লাবে চাকরি করতে লাগলেন, শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সঙ্গে থেকে সেখানেই বাস করতে থাকলেন। প্রবন্ধাদি লিখে তিনিও কিছু উপার্জনের চেষ্টা করতেন। কিন্তু এক বছর যাবৎ তিনি পেট ভরে খেতে পাননি, দারুণ শীতে গায়ে দেবার মতো একটি মোটা জামাও তাঁর ছিল না। সকালে কিছু রুটিমাখন ও চা এবং সন্ধ্যায় সস্তা দামের কিছু বেকন ছাড়া অর্থের অভাবে সারাদিনে তাঁর কিছু আর খাওয়াই হ'ত না। সুতরাং এই সময়টাতে অতি কষ্টে প্রায় অনাহারে তাঁর দিন কেটেছে। এই কষ্ট ভোগ করার দ্বারাই তিনি বুঝলেন যে, মনের জোর থাকলে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব জিনিসটা মোটে গায়েই লাগে না, যদি সুখে থাকবার লালসা ও স্বার্থবোধের ভাবটা নিজের মন থেকে জোর ক'রে তাড়িয়ে দেওয়া যায়। যার মনে স্বার্থসুখের দিকে কোনো টান নেই, তার পক্ষে আরামে থাকা আর কষ্টে থাকা সমানই কথা। তখন এই ভাবটাই তাঁর মনে আনবার চেষ্টা ক'রে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন যে, স্বার্থসুখের দিকে তিনি জীবনে আর মোটে চাইবেনই না। তিনি এসেছেন জগতের কাজ করতে, সুখ ভোগ করতে নয়। সুতরাং দারিদ্র্যের দারুণ কষ্টের ভিতর দিয়েও নিজের কাজটি তিনি ঠিকই ক'রে যেতে লাগলেন। আর

সেই অল্প বয়সেই তিনি জানলেন যে, সুখের চেয়ে দুঃখের কাছেই অনেক বেশি দামী শিক্ষা মেলে। এ কথা তিনি বরাবরই বলতেন।

দেশপ্রেমের বীজবপন

আরো এক কথা, বলতে গেলে এই সময় থেকেই দেশপ্রেমের বীজ তাঁর মনে ধীরে ধীরে ও গোপনে উপ্ত হয়। এর আগে নিজের দেশের অবস্থার সম্বন্ধে কোনো কিছু খবরই তিনি রাখতেন না। কেমন ক'রে রাখবেন, বাল্যকাল থেকে বিলাতী মানুষদের আব-হাওয়াই তাঁকে অষ্টপ্রহর ঘিরে আছে, দেশের কারো সঙ্গে তাঁর পরিচয়টুকু পর্যন্ত নেই। তবে সেই বিদেশী আবেষ্টনের মধ্যে বাস ক'রে দেশের প্রতি দরদ তাঁর মনে ঢুকল কেমন ক'রে? আশ্চর্যের কথা, এ জিনিসের বীজ প্রথম এসে পড়ল তাঁর ইংরেজী শিক্ষাপ্রিয় পিতারই কাছ থেকে। চৌদ্দ বছর বয়স হতেই পিতা মনে করলেন তাঁর এই প্রিয় ছেলেটি এবার সাবালক হয়েছে, তাই লম্বা লম্বা চিঠিতে তিনি তাঁর সব কিছু মনের কথা ছেলের কাছে খুলে লিখতে থাকলেন। সেই সব চিঠির মধ্যেই তিনি বিস্তার ক'রে লিখতেন ভারতীয় লোকদের প্রতি বিদেশী শাসকদের হৃদয়হীন অত্যাচারের কথা। তাই নিয়ে তিনি নিজেও যথেষ্ট তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করতেন, আর "বেঙ্গলী" কাগজে যে সব অত্যাচারের বিবরণ প্রকাশিত হ'ত, আর সেই কাগজে তাই নিয়ে যা কিছু সমালোচনা করা হ'ত, সেগুলি সমস্তই তিনি বিশেষ ক'রে দাগ দিয়ে পাঠাতেন। এর উদ্দেশ্য ছিল এই যে, ছেলে আগের থেকে এগুলি ভালো ক'রে জেনে রাখুক, তার পরে সে যখন দেশে ফিরে উচ্চ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন এর

যথাযোগ্য প্রতিকার করবে। কিন্তু এগুলি পড়ে শ্রীঅরবিন্দের মনে ধীরে ধীরে অন্য এক রকমের চেতনা জেগে উঠতে থাকল। তিনি এই প্রথম জানতে পারলেন যে, তিনি এক পরাধীন দেশের মানুষ, তাঁর নিজের দেশের লোকেরা বিদেশীর দাসত্বের শৃঙ্খলে বাঁধা, অমানুষিক অত্যাচার সহ্য ক'রেই তাদের বেঁচে থাকতে হয়, কেউ কিছুই তার প্রতিকার করতে পারে না। এই সব কথা জেনেশুনে তিনি কি নিজে নির্বিকার হয়ে থাকবেন? তাঁর কি কিছুই করবার নেই? তিনি আগের থেকে জানতেন যে, জগতের কোনো বড়ো কাজে তাঁকে অংশগ্রহণ করতে হবে, এবার জানলেন যে, এই কাজটিই হবে তাঁর জীবনের সব চেয়ে বড়ো কাজ, নিজেদের দেশকে এই পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা। ভারতকে স্বাধীন করতে হবে, এই কাজেই তাঁর জীবন উৎসর্গ করতে হবে। এই হলো তাঁর জীবনের ব্রত।

তখনকার দিনে এবং এখনকার দিনেও চৌদ্দ পনের বছরের ছেলের মনে এমন একটা বিরাট সংকল্পের উদয় হওয়া অসম্ভব বলেই মনে হয়। ধুরন্ধর দেশনেতারাও তখন দেশকে স্বাধীন করবার কথা মনে মনে কল্পনা করতে পারতেন না, কোনো কিশোর বালক তো দূরের কথা। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের কল্পনাশক্তিও অসাধারণ, তাঁর সব কিছুই অসাধারণ। তাঁর কোনো সংকীর্ণ সাংসারিক পরিবেশ নেই, কোনো আত্মীয়স্বজন কাছে নেই, নিজের পড়াশোনা এবং কল্পনা নিয়েই তিনি আছেন। জগতের সমস্ত অতীত ও বর্তমান ইতিহাস তিনি পড়েছেন, প্রচুর সাহিত্য পড়েছেন, তাতেই তাঁর দৃষ্টি অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে গেছে। তিনি দেখলেন যে, পৃথিবীর সকল

সভ্য দেশই স্বাধীন, কেবল তাঁর দেশই পরাধীন। এ দেশের পরাধীনতা মোচন করবার অসমসাহসিক প্রচেষ্টা তাঁকে করতেই হবে, নতুবা তাঁর জীবনই বৃথা।

এতখানি পর্যন্ত ভাবটা অবশ্য একেবারেই তাঁর মনে সুপরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি। পিতার চিঠিতে চিঠিতে যে বীজ ধীরে ধীরে উপ্ত হয়েছিল, তা স্পষ্ট আকারে অঙ্কুরিত হ'তে প্রায় চার বছর সময় লেগেছিল। কিন্তু সেই মহাব্রতকে সফল করতে হ'লে প্রথমে কোন্ পথে এ কাজ শুরু করা যেতে পারে? অতঃপর সেই চিন্তাই তাঁকে পেয়ে বসল। বিভিন্ন দেশের ইতিহাস থেকে তিনি জেনেছেন যে, কেমন ভাবে তারা দেশব্যাপী বিপ্লবের সৃষ্টি ক'রে পরাধীনতা থেকে মুক্ত হয়েছে। তিনি পরম আগ্রহের সঙ্গেই পড়েছেন ফ্রান্স দেশের জোয়ান দ'আর্কের কথা, ইটালির ম্যাট্‌সিনির কথা, আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রামের কথা। তখন ভারতের সম্বন্ধে সন্ধান নিয়ে জানলেন যে, সেখানেও একটা কিছু প্রচেষ্টা চলেছে, কিন্তু সে চেষ্টা ভারতমুক্তির জন্য নয়, তার উদ্দেশ্য পরাধীনতারই কিছু অদল-বদল। দাদাভাই নৌরোজী ও সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতির দ্বারা যে নরমপন্থী দলের সৃষ্টি হয়েছে তারা স্বাধীনতার কথা আদৌ উচ্চারণই করে না, কেবল কংগ্রেসের মারফতে দুঃখের কাঁদুনি গেয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের আবেদন ও নিবেদন জানায়। তারা কেবল একটু সুযোগ পেতে চায়। শ্রীঅরবিন্দ তখনই বুঝে নিলেন যে, এ শুধু অরণ্যে রোদন, এতে কোনো ফল হবে না, ইংরেজরা ভিক্ষা দেবার জাত নয়। আর এ তো সত্যিকার দেশপূজাও নয়, মিথ্যার রং লাগানো কাগজের ফুল দিয়ে দেশপূজার অভিনয় মাত্র. রাজার

কাছ থেকে কিছু সুবিধা আদায় ক'রে নেবার জন্য। দেশের পূজায় হৃদয়ের ফুল চাই, অন্তরের আগ্রহ চাই, নিজেদের প্রাণকে তুচ্ছ ক'রে রীতিমত বিপ্লবের আয়োজন করা চাই। সর্বত্রই তাই নিয়ম।

আঠার বছর বয়সে লণ্ডনের পড়া শেষ ক'রে যখন তিনি কেম্‌ব্রিজের কলেজে গিয়ে ঢুকলেন, তখন মনে মনে তাঁর জীবনের কর্তব্য স্থির হয়ে গেছে, কোন্ কাজের জন্য তিনি এসেছেন তা সুনিশ্চিতরূপে জানা হয়ে গেছে।

কেম্‌ব্রিজে

কেম্‌ব্রিজে গিয়ে সেখানকার বিখ্যাত কিংস্ কলেজে তিনি ভর্তি হলেন, ট্রাইপস্ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হ'তে। সেই কলেজে ঢুকে এক বছরের মধ্যেই তিনি সেখানকার কাব্য রচনার প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করলেন এবং অন্যান্য সকল বিষয়েও পরীক্ষা দিয়ে সকল বিষয়েই প্রথম হয়ে সমস্ত প্রাইজগুলি একচেটিয়া ভাবে হস্তগত করলেন। পরে ক্ল্যাসিকাল ট্রাইপস্ পরীক্ষার প্রথম অংশটা তিনি পাস করলেন ছাত্রদের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার ক'রে। কলেজের প্রধান অধ্যাপক অত্যন্ত খুশি হয়ে তাঁকে ডেকে বললেন—'আমি তের বছর যাবৎ ছাত্রদের পরীক্ষা নিচ্ছি, কিন্তু তোমার মতো এমন উৎকৃষ্ট রচনা পরীক্ষার্থীদের মধ্যে এ পর্যন্ত কাউকে লিখতে দেখিনি'। এর পরে দ্বিতীয় একটি পরীক্ষা দিলে তিনি কেম্‌ব্রিজের গ্রাজুয়েট হ'তেন, কিন্তু সে পরীক্ষা তিনি দিলেনই না। গ্রাজুয়েট হবার অভিরুচি তখন তাঁর নেই। তাঁর জীবনের লক্ষ্য তখন অন্য দিকে।

ভারতীয় মজলিশ

কেম্‌ব্রিজে গিয়ে লেখাপড়া করতে এবং পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করতে থাকলেও প্রতিভা বিকাশের দিকে তাঁর মন নেই, দেশের পরাধীনতার কথা সর্বক্ষণই তাঁর মনে জেগে রয়েছে। কেম্‌-ব্রিজে তিনি দেখলেন যে, সেখানে ভারতীয় যুবকদের একটি দল আছে, তাদের এক বিশেষ আড্ডাও আছে, তার নাম 'ভারতীয় মজলিশ'। তিনি আগ্রহের সঙ্গে সেই মজলিশে যোগ দিলেন এবং কিছুকালের জন্য তার সেক্রেটারিও হয়ে রইলেন। ঐ মজলিশের সভাতে তিনি ভারতের দুর্দশা সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনা দিয়ে রীতিমত বিপ্লববাদী বক্তৃতা দিতে শুরু করলেন। সেই প্রথম উচ্চারিত বাণীর ভিতর দিয়ে তাঁর অন্তরের জ্বালাময়ী অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হ'তে লাগল। সেই প্রথম তিনি প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহের আগুন ছড়াতে আরম্ভ করলেন। তিনি বললেন, 'ভারতে গিয়ে যারা শাসনের নামে মানুষের উপর অকথ্য অত্যাচার করছে, আমরা ভারতবাসী হয়ে তাদের দেশে এসে আরামে রয়েছি ব'লে সে সব অত্যাচারের কাহিনী নির্বিকার চিত্তে শুধু শুনেই যাব? এ অত্যাচার কি আমরা থামিয়ে দিতে পারি না?' তার পরেই তিনি বলতেন বিদ্রোহের কথা, আর বিদ্রোহ সৃষ্টি সম্বন্ধে যে সব পরিকল্পনা তাঁর মাথায় আসত তারও কিছু কিছু আভাষ দিতেন। বলাবাহুল্য এ সংবাদটি যথা-সময়ে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষদের কানে গিয়ে পৌঁছল।

লণ্ডনে আই. সি. এস্. পরীক্ষা

শ্রীঅরবিন্দের পিতার বরাবরই এই ইচ্ছা ছিল যে, এই ছেলেটি তাঁর আই. সি. এস্. পরীক্ষা দিয়ে দেশে গিয়ে জজ কিংবা ম্যাজিষ্ট্রেট

হবে। তাঁর আগ্রহেই শ্রীঅরবিন্দ সেই বছরে কেম্‌ব্রিজ থেকে লণ্ডনে ফিরে গিয়ে আই. সি. এস্. পরীক্ষা দিলেন এবং অনায়াসে সেই পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন। গ্রীক ও ল্যাটিন পরীক্ষাতে তিনি এত বেশি নম্বর পেলেন যে, ইতিপূর্বে তত বেশি নম্বর কেউ কখনো পায়নি। সকল পরীক্ষায় পাস হ'লে তখন ঘোড়ায় চড়ার পরীক্ষা দিতে হয়, কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে তার জন্য তিনি মোটে হাজিরই হলেন না। শোনা যায় যে, ঐ সময় তিনি বন্ধুদের সঙ্গে বসে তাস খেলছিলেন। বন্ধুরা বার বার তাঁকে পরীক্ষার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেও তিনি তা গ্রাহ্য না ক'রে বললেন, 'আর একটু খেলা যাক'। এইভাবে সময়টা উত্তীর্ণ হয়ে গেল। এ পরীক্ষা পরে অন্য সময়েও দেওয়া চলত, কিন্তু আসলে তাঁর মনোগত ইচ্ছা নয় যে, তিনি সিভিলিয়ান হয়ে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের দাসত্ব করেন, কাজেই সুযোগটা থাকলেও তা তিনি গ্রহণ করতে চাইলেন না। আর ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টও চায় না যে, কেম্‌ব্রিজে যে যুবক রাজদ্রোহ-সূচক বক্তৃতা দিত তাকে অমন দায়িত্বের কাজে নিয়োগ করা হয়। অতএব তাঁর পিতার যা আন্তরিক ইচ্ছা ছিল তা সফল হ'ল না, তাঁর আর ম্যাজিস্ট্রেট হওয়া ঘটল না। শেষ পর্যন্ত তিনি কেম্-ব্রিজের গ্রাজুয়েট কিংবা ব্রিটিশদের আই. সি. এস্. কোনোটাই হলেন না। ইচ্ছা ক'রেই হলেন না।

লণ্ডনে গুপ্ত সমিতি

শ্রীঅরবিন্দ লণ্ডনে গিয়ে দেখেন যে, ইতিমধ্যেই সেখানে ভারতীয় বিপ্লববাদীদের এক গুপ্ত সমিতি গড়ে উঠেছে, তার নাম "Lotus

and Dagger" (বাংলাতে বলা চলে "কমল ও কৃপাণ")। শ্রীঅরবিন্দেরা তিন ভাইই এই গুপ্ত সমিতিতে গিয়ে যোগ দিলেন। এখানকার সভ্যেরা দেশ থেকে ব্রিটিশ শাসকদের উচ্ছেদ ক'রে দেবার সম্বন্ধেই আলোচনা করতেন। তাঁরা বলতেন যে, বিদেশী জাতি ভারতের অন্ন খেলেও ভারতকে আপন দেশের মতো মনে করতে পারে না। যাদের সঙ্গে আমাদের কেবল খাদ্য-খাদকের সম্পর্ক ছাড়া আর কোনো সম্পর্ক নেই, তাদের কোনোমতেই আর আমাদের দেশে রাজত্ব করতে দেওয়া যেতে পারে না। এই সংকল্পকে বাস্তবে পরিণত করবার জন্য তাঁদের মধ্যে প্রত্যেকেই শপথ নিয়ে এই প্রতিজ্ঞা করলেন যে, দেশ থেকে ব্রিটিশ শাসকদের তাড়াতে প্রত্যেকেই এক একটি বিশেষ কাজের ভার নেবেন, আর তা সফল ক'রে তুলতে নিজেদের জীবনপণ করবেন। সেই সমিতি অবশ্য কিছুদিন পরে উঠে গেল এবং ঐ সকল সভ্যেরা তাঁদের প্রতিজ্ঞার কথাটা আর মনেই রাখলেন না। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ একবারও ভোলেননি, তাঁর প্রতিজ্ঞায় তিনি অবহিত রইলেন।

বাংলা বর্ণপরিচয়

আই. সি. এস্. পরীক্ষা দেবার উপলক্ষে তিনি প্রথম বাংলা বর্ণ-পরিচয় শেখেন লণ্ডনে। ভারত প্রত্যাগত একজন অবসরপ্রাপ্ত জজ তাঁকে বাংলা অক্ষর পরিচয় করান। কিন্তু শিক্ষকের নিজেরই বিদ্যার পুঁজি অতি সামান্য, কাজেই ঐ সময়ে শ্রীঅরবিন্দ নিজের চেষ্টায় যতটুকু শিখলেন ততটুকুই শেখা হ'ল। তাতেই বাংলা বই

কিছু পড়তে ও বুঝতে শিখলেন। এই হ'ল বাংলা ভাষার সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়।

প্রত্যাবর্তন

আই. সি. এস্. পরীক্ষাতে সাফল্য না হওয়ায় শ্রীঅরবিন্দের পিতা তাঁকে দেশে ফিরে আসতে বললেন। স্থির হ'ল যে, বড়ো দুই ভাই বিলাতেই থাকবে, কেবল তিনি একাই ফিরবেন। কিন্তু কোনো একটা কাজের ব্যবস্থা না ক'রে শুধু শুধু দেশে ফিরে কি লাভ আছে? তাই তিনি তাড়াতাড়ি দেশে না ফিরে বিলাতে থেকেই কাজের সন্ধান করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে বরোদার মহারাজা সয়াজি গাইকোয়াড় বিলাতে গিয়ে উপস্থিত হলেন, তিনিও তাঁর স্টেটে কাজ করবার জন্য একজন উপযুক্ত লোক খুঁজছিলেন। কটন নামক একজন উভয়েরই জানিত ব্যক্তি উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ ঘটিয়ে দেন। শ্রীঅরবিন্দের অপূর্ব প্রতিভার পরিচয় পেয়ে মহারাজা খুশি হয়ে তৎক্ষণাৎ তাঁকে নিজের স্টেটের কাজে নিযুক্ত ক'রে নেন। বরোদা রাজ্যের চাকুরি নিয়ে তিনি এবার দেশে ফিরে আসবার আয়োজন করলেন। এ হ'ল ১৮৯৩ সালের কথা।

আধ্যাত্মিক হিসাবে ভারতীয় ইতিহাসে এই ১৮৯৩ সালটি এক স্মরণীয় বৎসর। এই বছরেই স্বামী বিবেকানন্দ ভারত থেকে বিদেশ যাত্রা করেন সারা পৃথিবীতে ভারতের অমৃতবাণী প্রচার করতে, আর এই বছরেই শ্রীঅরবিন্দ দেশে ফিরে আসেন দেশকে মুক্তিমন্ত্র দিতে এবং তার থেকে সারা জগৎকে মুক্তিমন্ত্র দেবার সূত্রপাত করতে।

তৃতীয় অঙ্ক

বরোদা পর্ব (তের বছর)

এপোলো বন্দরে

দীর্ঘ চৌদ্দ বছর বিলাতে থাকার পর ১৮৯৩ সালে একুশ বছর বয়সে শ্রীঅরবিন্দ দেশে ফিরে বোম্বাইএর এপোলো বন্দরে এসে নামলেন। সেই সময় দেশে পোঁছবামাত্রই এক অপূর্ব অনুভূতিতে তাঁর সারা অন্তরটি ছেয়ে গেল। সেই অনুভূতি এমন যে, তার পর থেকে চিরকালই তাঁর সেটা মনে গাঁথা হয়ে ছিল। জ্ঞানোন্মেষের পরে প্রথম তিনি নিজের মাতৃভূমিতে এসে পা দিচ্ছেন, এতে তাঁর মনে খুব একটা ঔৎসুক্য আর আনন্দ আসবারই কথা। কিন্তু জাহাজ থেকে নামবার সঙ্গে সঙ্গেই সম্পূর্ণ অন্য রকমের একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে গেল। তিনি দেখলেন যে, ভারতের মাটিতে পা দিয়েই তাঁর মনটি হঠাৎ একেবারে নিশ্চল ও নিথর হয়ে গেছে, সেখানে কোনো আলোড়ন নেই, ঔৎসুক্য নেই ; সুখ-দুঃখের কোনো তরঙ্গই নেই। মনের ভিতরকার অবস্থাটা একেবারে আকাশের মতো উদার, প্রশান্ত ও নিরুদ্বিগ্ন। তার পরে তিনি যেখানেই যান বা যা কিছুই করুন, এই ভাবটাই তাঁর মনের মধ্যে কিছুদিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়ে রইল। যেন দেশের মাটিতে পা দিয়েই তাঁর অন্তরাত্মা পরম নিশ্চিন্ত হয়েছে, ভাবনাচিন্তা করবার আর কিছুই নেই।

পিতার মৃত্যু

দেশে ফিরে কিন্তু নিজের পিতার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হ'ল না। এসেই শুনলেন যে, কয়েকদিন আগে তাঁর পিতার আকস্মিক মৃত্যু

ঘটেছে। শ্রীঅরবিন্দ জাহাজডুবি হয়ে মারা গেছেন এই অনুমান ক'রে শ্রীঅরবিন্দেরই নাম করতে করতে তিনি অজ্ঞান হয়ে যান, তার পরে হার্টফেল হয়ে মারা গেছেন। ব্যাপারটা এই যে, শ্রীঅরবিন্দের দেশে প্রত্যাবর্তন তিনি খুব আগ্রহের সঙ্গেই প্রত্যাশা করছিলেন, এমন কি এক মাসের ছুটি নিয়ে কিছুদিন আগে তিনি বোম্বাই চলে যান ছেলেকে জাহাজ থেকে নামিয়ে আনতে। কিন্তু কবে কোন্ জাহাজে তিনি আসছেন তার কোনোই সন্ধান না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে আসেন। তার পরেই খুলনায় তাঁর কাছে হঠাৎ জাহাজডুবির খবর নিয়ে এক টেলিগ্রাম আসে। এতেই তিনি পুত্রশোকে অধীর হয়ে অজ্ঞান হয়ে যান। দুদিন পরে তিনি মারা যান। কিন্তু যে জাহাজ ডুবেছে, শ্রীঅরবিন্দ প্রকৃতপক্ষে সেই জাহাজে ওঠেননি, উঠেছিলেন তার পরের জাহাজে। একটা ভুল ধারণা থেকে মনে অত্যন্ত আঘাত পেয়ে কৃষ্ণধনের অকাল মৃত্যু ঘটল।

বরোদার চাকরি

ভারতে ফিরে এসে শ্রীঅরবিন্দ বরোদার চাকরিতে গিয়ে যোগ দিলেন। সেখানে কাজ শেখাবার জন্য একে একে তাঁকে রাজদপ্তরের নানা বিভাগে নিয়োগ করা হ'তে থাকে, প্রথমে সেটেলমেণ্ট বিভাগে, তার পরে রাজস্ব বিভাগে, তার পরে সেক্রেটারিয়েট বিভাগে। অবশেষে তাঁর নিজেরই প্রস্তাব অনুযায়ী তাঁকে রাজার কলেজে শিক্ষাবিভাগে নিযুক্ত করা হয়। প্রথমে তিনি ফরাসী ভাষার শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হ'ন, তার পরে ইংরেজী সাহিত্যের প্রফেসররূপে স্থায়িভাবে কাজ করতে থাকেন। এ কাজ তিনি অসাধারণ দক্ষতার

সঙ্গে করতে থাকলেন এবং অল্পদিনেই ছাত্রমহলে তাঁর খুব সুখ্যাতি রটল। সকলেই বললে যে, এত বড়ো জ্ঞানী অথচ এমন অমায়িক ও সহৃদয় প্রফেসর ইতিপূর্বে কখনো দেখা যায়নি। প্রফেসর থেকে ঐ কলেজের তিনি ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল ও পরে প্রিন্সিপ্যাল পর্যন্ত হয়েছিলেন।

মহারাজা তাঁকে আপন অন্তরঙ্গের মতোই ভালোবাসতেন। একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া করবার জন্য প্রায়ই তাঁকে রাজপ্রাসাদে ডেকে পাঠাতেন, তাঁর সঙ্গে নানা বিষয়ে পরামর্শও করতেন, কখনো বা স্টেটের গুরুত্বপূর্ণ কোনো চিঠিপত্র লিখতে হ'লে কিংবা কোনো বিশেষ বক্তৃতা দিতে হ'লে তাঁকে দিয়ে ইংরেজীতে তার খসড়া করিয়ে নিতেন, কারণ তিনি জানতেন যে, এঁর মতো সুন্দর ইংরেজী আর কেউ লিখতে পারবে না।

আরো জ্ঞানসঞ্চয়

কলেজের ছাত্রেরা এবং প্রফেসররাও সকলে জানত যে, তিনি একজন মহাবিদ্বান ব্যক্তি, পাণ্ডিত্যের চরম সীমায় তিনি উঠে গেছেন। কিন্তু এদিকে শ্রীঅরবিন্দের মনে তাই নিয়ে একটুও গর্ব নেই, বরং তাঁর আবার নূতন ক'রে শুরু হ'ল ছাত্রাবস্থা। পরের দেশ ইউরোপের সকল কিছু জ্ঞানই তিনি এতাবৎ সঞ্চয় ক'রে এসেছেন, কিন্তু নিজের দেশের জ্ঞানগুলির সম্বন্ধে তিনি আজও পর্যন্ত কোনো কিছুই জানেন না। অথচ দেশকে তিনি ভালোবাসেন, দেশের জন্য তাঁর প্রাণ কাঁদে,—দেশকে আদৌ না চিনে এ তাঁর কেমন ভালোবাসা? দেশকে ভালোবাসবার উপযুক্ত হ'তে হ'লে

আগে দেশের সব কিছু ভিতরের কথাই তাঁকে ভালো ক'রে জানতে হবে, সব কিছু জ্ঞানই তাঁকে আয়ত্ত করতে হবে। চাকরির কাজটা যা করেন সে তো মাত্র অল্পক্ষণের ব্যাপার, বাকী সময়টা তিনি কি করবেন? তাই আবার নতুন জ্ঞানার্জন করবার স্পৃহা তাঁর দ্বিগুণ হয়ে বেড়ে উঠল।

ইউরোপের সাহিত্য ও কাব্য, ইউরোপের শিল্প ও বিজ্ঞান, ইউরোপের সভ্যতা ও ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর কিছুই জানতে বাকী নেই। এবার ভারতের ও এশিয়ার সম্বন্ধে সব কিছুই তাঁকে জানতে হবে। তখন তিনি বোম্বাই থেকে ও আরো নানাস্থান থেকে ঝুড়ি ঝুড়ি বই কিনতে শুরু করলেন। প্যাকিং বাক্সে বোঝাই হয়ে অনবরতই নতুন নতুন বই আমদানি হ'তে থাকল, বইতে বইতে স্তূপাকার হয়ে তাঁর ঘর-দোর ভরে গেল। যা কিছু বেতন পেতেন তার সামান্যই নিজের জন্য খরচ করতেন, কিছু টাকা পাঠাতেন মা ও বোনের কাছে, বাকী সমস্তটাই বই কেনায় খরচ হয়ে যেত। শুধু কেনা নয়, সকল বই-ই তিনি গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত খুঁটিয়ে পড়তেন। রাত জেগেও তাঁর বই পড়া চলত। তখন দেখা যেত যে, সর্বক্ষণই তিনি বই নিয়ে মগ্ন হয়ে আছেন। প্রত্যহ রাত জাগার দরুন তিনি অনেক বেলাতে ঘুম থেকে উঠতেন, কিন্তু একটু চা রুটি খেয়েই আবার বই নিয়ে বসতেন। দুপুরে বই ছেড়ে উঠে স্নান ক'রে খেয়ে একবার কলেজে যেতেন, আবার ফিরে এসেই বই পড়া শুরু করতেন। সন্ধ্যা হ'লে কেরোসিনের একটা বাতি জ্বালা হ'ত, সেই বাতি মধ্যরাত্রের পরেও সমানে জ্বলতে থাকত। তখনও তিনি সেই এক ভাবে বসে থাকতেন,

বই পড়ার মধ্যে একান্তভাবে নিবিষ্ট হয়ে, খেতে হবে বা ঘুমোতে হবে সে বিষয়ে কিছুমাত্র খেয়াল নেই।

এরই মধ্যে তিনি সংস্কৃত ভাষাটিকে উত্তমরূপে আয়ত্ত ক'রে ফেললেন। কারো সাহায্য না নিয়ে এই ভাষাটিকে তিনি নিজে নিজেই শিখলেন, আর যত কিছু সংস্কৃত কাব্য ও সাহিত্য নিজে নিজেই আদ্যোপান্ত পড়ে ফেললেন। শুধু তাই নয়, ঐ সঙ্গে তিনি হিন্দী ভাষাটিও শিখে নিলেন, তা ছাড়া আবার গুজরাটি এবং মারাঠী ভাষাও শিখলেন। নতুন নতুন ভাষা শিখতে তিনি চিরকালই ওস্তাদ। এইভাবে নতুন নতুন ভাষাগুলি শিখে তিনি আমাদের দেশের সব কিছু কথাই একে একে জানলেন। শুধু একবার পড়ে রাখা তো নয়, তিনি যা কিছুই পড়তেন তাই নিখুঁতভাবে মনে রাখতেন। স্মৃতিশক্তি তাঁর এমনই প্রখর যে, একবার যা পড়বেন তা আর কিছুতেই ভুলতেন না, কোন্ কথাটি কোন্ বইতে আছে তা নির্ভুলভাবে ব'লে দিতে পারতেন। এ ক্ষমতাটি তাঁর শেষ বয়স পর্যন্তই অটুট ছিল।

'পুরানো ছেড়ে নতুন আলো জ্বালো'

দেশে ফেরার পর থেকে এ পর্যন্ত তাঁর অন্তরের জ্বালাময়ী দেশপ্রেমের সম্বন্ধে কিছু বলা হয়নি। সেই আসল চিন্তাটি সর্বদাই তাঁর মনের মধ্যে জাগরূক ছিল। বরোদায় অবস্থানের মাত্র ছয় মাস পর থেকেই তার প্রত্যক্ষ লক্ষণ প্রকাশ পেতে শুরু করল। এখান আসা পর্যন্ত এখানকার নরমপন্থী কংগ্রেসের ইংরেজতোষণ-কারী নেতাদের আবেদন ও নিবেদনের প্রণালী তিনি বরাবরই লক্ষ্য

করছিলেন। তাঁরা সকলেই জ্ঞানী ও গুণী এবং বয়সে ওঁর চেয়ে অনেক বড়ো, উনি তাঁদের কাছে বালক মাত্র। কিন্তু তবু তাঁদের খোষামোদী আচরণে স্থির থাকতে না পেরে তখনই তাঁদের বিরুদ্ধে তিক্ত প্রবন্ধ লিখতে শুরু করলেন। এই সকল প্রবন্ধ তিনি নিজের নাম দিয়ে লিখতেন না, ছদ্মনামে লিখতেন। প্রবন্ধগুলি লেখবার এক সুযোগ জুটে গেল। কেমৃব্রিজে থাকতে কেশবরাও দেশপাণ্ডে নামে তাঁর এক মহারাষ্ট্রীয় সহপাঠী ছিলেন, তিনি দেশে ফিরে "ইন্দুপ্রকাশ" নামক এক পত্রিকা প্রকাশ করেন, আর শ্রীঅরবিন্দকে তাতে লিখতে অনুরোধ করেন। তাতেই "New Lamps for Old" (পুরানো ছেড়ে নতুন প্রদীপ জ্বালো) নাম দিয়ে তিনি কতকগুলি ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখে যেতে থাকেন। এ প্রবন্ধে ছিল কেবলই নরমপন্থীদের উপর তীব্র আক্রমণ। তাতে তিনি যা লিখেছিলেন তার একটু নমুনা দেওয়া গেল :

"আমাদের শত্রু বাইরের কেউ নয়, নিজেদের ভীরুতা ও দুর্বলতাই আমাদের আসল শত্রু। দেশের কংগ্রেস চলেছে ভুল পথে, তার মধ্যে কোনো হৃদয়ের টান নেই। যে পথে চলা হচ্ছে তা ঠিক পথ নয়, যারা চালবার নেতা হয়ে দাঁড়িয়েছে তারা বিশ্বাসযোগ্য সত্যিকার নেতা নয়। আমরা অন্ধ হয়ে এমন লোকদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছি যারা নিজেরাও অন্ধ নতুবা এক চোখ কানা। আর কোথায় কংগ্রেস? আমাদের দেশবাসীদের কংগ্রেস এটা নয়, যাদের নিয়ে এই দেশ তারাই এর মধ্যে নেই, আছে কেবল যত ব্যারিষ্টার, ডাক্তার, চাকুরে, ব্যবসাদার ও ইংরেজী শিক্ষিতের দল, যারা ইংরেজদের আওতায় থেকেই প্রাণ বাঁচায়। যে কংগ্রেস হওয়া উচিত ছিল সাহারা মরুভূমিতে তৃষ্ণা মেটাবার জলাশয়, যা হওয়া উচিত আমাদের আশা

ভরসার স্থান, মুক্তির তীর্থযাত্রায় একটিমাত্র পথনির্দেশক পতাকা, যা হওয়া উচিত আমাদের দেশের সকল জাতীয় সকল মানুষদের মিলনমন্দির, সেখানে ঐ তথাকথিত মধ্যবিত্তের দল ছাড়া আর কারো স্থান নেই।"

দেশে ফেরার ছয় মাসের মধ্যেই তাঁর এই স্পষ্টোক্তি সাময়িক পত্রিকায় ছাপা হয়ে বেরিয়ে গেল। যারা এই প্রবন্ধগুলি পড়লে তারা একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল, এর ভাষার স্পষ্টতা ও কথার বাঁধুনি দেখে তারা অবাক হয়ে গেল। কার কলমের জোর এতখানি হ'তে পারে! ঐ ধরনের প্রবন্ধ সাত দফা মাত্র বেরোবার পরেই নরমপন্থীরা আর স্থির থাকতে পারলে না। নরমপন্থীদের অন্যতম দলপতি রাণাড়ে স্বয়ং ঐ পত্রিকার মালিকের বাড়িতে গিয়ে হানা দিলেন, তাকে শাসিয়ে বললেন—এই সর্বনেশে প্রবন্ধ ছাপানো এখনই বন্ধ কর, বন্ধ কর, নইলে তোমার কাগজ ছাপানোই বন্ধ হয়ে যাবে। এর পরে আর অমন প্রবন্ধ তাতে লেখা চলে না, শ্রীঅরবিন্দকে অগত্যা থেমে যেতে হ'ল। দেশপাণ্ডের অনুরোধে তিনি মাঝে মাঝে সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে অন্যান্য রকমের প্রবন্ধ লিখতেন। কিন্তু আর দেশপ্রেমের সম্বন্ধে কোনো কথাই তিনি উল্লেখ করলেন না। বুঝলেন যে তার এখনও সময় হয়নি।

বাংলা ভাষায় উন্নতি

অতঃপর তিনি বাংলা ভাষাটি আরো ভালো ক'রে শিখবার দিকে মন দিলেন। বাংলা পড়তে এবং লিখতে তিনি ইতিপূর্বেই শিখে নিয়েছেন, কিন্তু এটি তাঁর আপন মাতৃভাষা, এই ভাষাতে তাঁর অনায়াসে কথা বলতে পারা দরকার, এই ভাষায় স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীতে

প্রবন্ধাদি লিখতে পারা দরকার, কোথায় কোন্ শব্দটির সমুচিত প্রয়োগ হবে ও কেমন তার উচ্চারণ হবে সেগুলি জানা দরকার। একজন বাঙালী সাহিত্যিককে এই সব বিষয়ে শিক্ষা দেবার জন্য নিযুক্ত করলে ভালো হয়। তিনি তাঁর মামাদের কাছে এই কথা লিখে পাঠালেন। তাঁরা দীনেন্দ্রকুমার রায়কে ওঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

দীনেন্দ্রকুমার ছিলেন একজন লেখক। তখনকার শ্রীঅরবিন্দকে তিনি যেমন দেখেছিলেন তার একটি বিশদ বর্ণনা পরে লিখেছিলেন "অরবিন্দ প্রসঙ্গ" নাম দিয়ে, ভারী চমৎকার। সেই বর্ণনা থেকেই বোঝা যায় যে, ভারতে এসে আর ভারতকে ভালোবেসে সেই আন্‌কোরা বিলাতফেরত ও কেম্‌ব্রিজের কলেজে পড়া তরুণ যুবক কেমন হয়ে গিয়েছিলেন। এখানে সেই বর্ণনা থেকে অল্প একটু উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি:

"পায়ে শুঁড়ওয়ালা সেকেলে নাগরা জুতা, পরিধানে আহমদাবাদের মিলের বিশ্রী পাড়ওয়ালা মোটা খাদি, কাছার আধখানা খোলা, গায়ে আঁটা মেরজাই, মাথায় লম্বা লম্বা গ্রীবাবিলম্বিত বাবরীকাটা পাতলা চুল, মধ্যে চেরা সিঁথি, মুখে অল্প অল্প বসন্তের দাগ, চক্ষুতে কোমলতাপূর্ণ স্বপ্নময় ভাব, শ্যামবর্ণ ক্ষীণদেহধারী এই যুবক ইংরাজী, ফরাসী, লাটিন, হিব্রু, গ্রীকের সজীব ফোয়ারা শ্রীমান অরবিন্দ ঘোষ! দেওঘরের একটা পাহাড় দেখাইয়া কেউ যদি বলিত 'ঐ হিমালয়' তাহা হইলেও বোধ হয় ততদূর বিস্মিত ও হতাশ হইতাম না।* যাহা হউক, দুই একদিনের ব্যবহারেই বুঝিলাম অরবিন্দের হৃদয়ে পৃথিবীর হীনতা ও কলুষতা নাই। তাঁহার হাসি শিশুর হাসির মত সরল তরল ও সুকোমল।"

দেশকে সত্যিকার ভালোবাসলে মানুষ এই রকমই হয়ে যায়। তখন দেশের আচার-ব্যবহার প্রভৃতি সব কিছুই তার অত্যন্ত ভালো লাগে, বিদেশী কোনো কিছুই সহ্য হয় না। তিনি ইচ্ছা ক'রেই ভারতের একজন সাধারণ গেঁইয়া লোকের মতো থাকতেন। কেবল কলেজে যাবার সময় কোটপ্যাণ্ট পরতেন বটে, কিন্তু মাথায় জড়াতেন পাগড়ি। চিরদিনই তিনি মিতাহারী, ডাল-ভাত কিংবা রুটি, একটা যাহোক তরকারি, একটু দুধ, এই হ'লেই তাঁর চলে যেত। শুতেন একটা লোহার খাটে, শীতের সময় লেপ পর্যন্ত থাকত না। মোট কথা তাঁর চালচলনের মধ্যে বিলাতের বিলাসের নামগন্ধও কোথাও নেই। তাঁকে দেখলে তখন কে বলবে যে, কোনোকালে তিনি বিলাতে গিয়েছিলেন ?

বঙ্কিমের "বন্দে মাতরম্"

ভালো ভাবে বাংলা ভাষা বুঝতে ও বলতে শিখে তিনি একে একে অনেক রকমের বাংলা বই পড়লেন। তার মধ্যে সব চেয়ে তাঁর ভালো লাগল মাইকেলের কাব্য আর বঙ্কিমের উপন্যাস। এতই বেশি ভালো লাগল যে, তিনি মাইকেল মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে "ইন্দুপ্রকাশ" পত্রিকাতে পর পর অনেকগুলি আবেগময় প্রবন্ধ লিখে ফেললেন। বিশেষ ক'রে বঙ্কিমের "আনন্দমঠ" পড়ে তিনি একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। এই তো সেই দেশমাতার কথা, যাকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছেন। বিশেষত "আনন্দমঠে" এই যে দেশমাতৃকার বন্দনা গানের "বন্দে মাতরম্" কথাটি, এটিই তো তাঁর জীবনের বীজমন্ত্র। প্রথমে তিনি দেশানুভূতির বীজ পেয়েছিলেন

নিজের পিতার কাছ থেকে, এখন তারই আসল বীজমন্ত্রটি পেয়ে গেলেন বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকে। এ তো একটা সহজ মন্ত্র নয়, প্রাচীন ঋষিরা যেমন উপর থেকে প্রেরণা পেয়ে বেদমন্ত্র রচনা করেছিলেন, বঙ্কিমও তেমনি কোনো উপরের প্রেরণায় এই মন্ত্রটি আবিষ্কার করেছেন, তাই শ্রীঅরবিন্দ বললেন বঙ্কিমও একজন 'ঋষি'। ঋষি কথাটির অর্থ, যিনি দ্রষ্টা, যাঁর দৃষ্টি অজানার অন্ধকারকে তীরের ফলার মতো বিদ্ধ ক'রে চলে। এই ঋষির মন্ত্রে দীক্ষা পেয়ে শ্রীঅরবিন্দের যেন অন্তর্দৃষ্টি খুলে গেল, তিনি এবার আরো ভালো ক'রে উপলব্ধি করলেন তাঁর অন্তরবাসিনী দেশমাতাকে। ইটালির ম্যাটসিনি প্রভৃতি তাঁদের দেশমাতাকে যেরূপে চিনেছিলেন, ইনিও এতকাল সেই রূপেই দেশকে চিনছিলেন। কিন্তু এখন জানলেন যে, তিনি কেবল মৃত্তিকারূপিণী মা নয়, তিনি হলেন জীবন্ত ব্যক্তিস্বরূপিণী প্রাণময়ী মা। পরে এই ভাবটি নিয়ে আরো বেশি অগ্রসর হয়ে শ্রীঅরবিন্দ দিব্যদৃষ্টিতে দেখেছিলেন যে, তিনি কেবল আমাদের ভারতমাতাই নয়, তিনিই হলেন সারা জগতের জগন্মাতা। তাই পরে তিনি তাঁর "ভবানী মন্দির" নামক প্রচারপুস্তিকাতে লিখেছিলেন —"ইনিই হলেন শক্তিরূপিণী ভবানী। ইনিই দুর্গা, ইনিই কালী, ইনিই রাধা, ইনিই লক্ষ্মী, ইনিই আমাদের জগন্মাতা।" এ তাঁর একটা মনগড়া কল্পনার কথা নয়, এই হ'ল তাঁর হৃদয়ের সত্যিকার অনুভূতি। এ-কথা তিনি বরাবরই বলেছেন এবং বিশ্বাস করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে তিনি তৎকালে যে প্রবন্ধগুলি লিখেছিলেন তার থেকে কিছু উদ্ধৃত ক'রে দিলেই বোঝা যাবে যে, তিনি তখনই কেমন ধারণা পোষণ করতেন :

"বাংলার ভবিষ্যতের আশা খুবই উজ্জ্বল; কারণ বাংলা কাল যে কথা ভাববে, সমগ্র ভারত তার পরবর্তী সপ্তাহে তাই ভাবতে শুরু করবে।...এই বিশেষ গুণটি জাতির মধ্যে এসেছে প্রথমত বঙ্কিমেরই জাগরণ মন্ত্রের প্রভাবে। তরুণ বাংলা তার স্কুল কলেজ থেকে এ চেতনা পায়নি, যা কিছু পেয়েছে তা বঙ্কিমের উপন্যাস ও রবীন্দ্রনাথের কাব্য থেকে। এইজন্যই বলতে হয় জাতির ভাষাই হ'ল তার প্রাণদাতা।...বঙ্কিম ও মধুসূদন জগৎকে তিনটি অমূল্য অবদান দিয়ে গেছেন। তাঁরা গড়ে দিয়ে গেছেন এই বাংলা সাহিত্য, যার অমর সৃষ্টিগুলি ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনার সঙ্গে সমান পর্যায়ে দাঁড়াতে পারে। তাঁরা দিয়ে গেছেন এই নতুন বাংলা ভাষা। বাঙালী জাতি যদি মরে না যায় তাহলে এরও আর মৃত্যু নেই। এ জাতির মধ্যে উদ্দীপনা আছে, তেজস্বিতা আছে, প্রচুর কল্পনাশক্তি ও উদ্ভাবনীশক্তি আছে, জগতের জাতিগুলির মধ্যে এ জাতি প্রথম শ্রেণীর। কেবল যদি এদের যথেষ্ট অধ্যবসায় ও সহনশীলতা থাকে তাহলে এরা একদিন জগতের বরেণ্য জাতিদের মধ্যে স্থান ক'রে নেবে। এটা কম কথা নয়।..."

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের বাণী

এতকাল পর্যন্ত শ্রীঅরবিন্দ দর্শনশাস্ত্র ও ধর্মগ্রন্থাদি পড়ার দিকে বিশেষ ঝোঁক দেননি, আর ভগবানে বিশ্বাস করার ব্যাপার নিয়েও বিশেষ চিন্তা করেননি। কিন্তু ভারতের সেই আধ্যাত্মিক দিকটার প্রতি তিনি প্রথম আকৃষ্ট হলেন শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীগুলি ও স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতাগুলি পড়ে। এই সমস্ত জিনিস পড়ে তাঁর খুবই চমক লেগে গেল। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে তিনি আরো গভীরভাবে অনুসন্ধান নিয়ে দেখলেন, এবং ক্রমে ক্রমে তাঁকে তিনি বেশ ভালো

ক'রেই চিনলেন। তখনই বুঝলেন যে, এ ব্যক্তি সাধারণ মানুষ নয় শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে সময়ান্তরে তিনি উচ্ছ্বসিত ভাষায় বলেছিলেন :

"শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন ভাবে থাকতেন তাতে লোকে হয়তো তাঁকে পাগল ব'লেই ভাবতে পারত। এদিকে কিছুমাত্র লেখাপড়া জানা নেই, পাণ্ডিত্যের ধার দিয়েই যান না, এখনকার সভ্যতার কোনো কিছুই জানেন না, ভিক্ষান্ন খেয়ে দরিদ্রের মতো থাকেন, কিন্তু দেখা গেল যে, নানাস্থান থেকে কত গণ্যমান্য শিক্ষিত লোক, ইউরোপের কত জ্ঞানী ব্যক্তি, সবাই এসে এই ফকির সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে। ইনি ক'রে গেলেন সমগ্র মানবজাতির চোখ ফোটানোর কাজ, আর ভারতকে সকল দেশের শীর্ষস্থানে তুলে দেবার কাজ ইনিই প্রথম শুরু ক'রে গেলেন।"

গীতা ও উপনিষদাদি

এর আগেই তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের কাব্য ও নাট্য, কালিদাস ও ভবভূতি প্রভৃতি পড়ে শেষ করেছেন। এবার তিনি পড়তে শুরু করলেন গীতা, উপনিষদ, মনুসংহিতা, রামায়ণ ও মহাভারতের মূল গ্রন্থগুলি। শুধু তাই নয়, রামাযণ ও মহাভারতের কতক কতক অংশ তিনি ইংরেজী কাব্যে অনুবাদ করে ফেললেন। তিনি বললেন : "মহাকবি দান্তের কবিত্বে আমি মুগ্ধ হয়েছি, হোমরের ইলিয়ড্ পড়ে পরিতৃপ্ত হয়েছি, ইউরোপের সাহিত্যে এগুলি অতুলনীয়। কিন্তু বাল্মীকি হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ, রামায়ণের তুল্য মহাকাব্য পৃথিবীতে আর একটি নেই।"

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, তাঁর বয়স তখন মাত্র একুশ থেকে চব্বিশের মধ্যে। এরই মধ্যে তিনি ভারতের যত কিছু

কাব্য ও সাহিত্য, দর্শন ও পুরাণ পড়ে জীর্ণ ক'রে ফেলেছেন। এই সকল গ্রন্থাদি অধ্যয়ন ক'রে তিনি বিশেষ রকমেই বুঝে নিলেন যে, ভারতের বৈশিষ্ট্য কোথায় আর ভারতের মর্মকথা কি। পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্য ভাবধারার পার্থক্য কোথায় তা এখন তিনি ভালো ক'রেই বুঝলেন, কারণ দুই দেশেরই অন্তস্তল পর্যন্ত তিনি তলিয়ে দেখেছেন। পরে এই নিয়ে "ধর্ম" পত্রিকাতে তিনি নিজের বাংলাতেই লিখেছিলেন :

"পাশ্চাত্ত্য বাহিরের মিথ্যা অনুভব লইয়া ব্যস্ত, তাঁহারা ছায়ার ভক্ত; প্রাচ্য ভিতরের সত্য অনুসন্ধান করে, আমরা নিত্যের ভক্ত। পাশ্চাত্ত্য শরীরের উপাসক, আমরা আত্মার উপাসক। পাশ্চাত্ত্য নাম-রূপে অনুরক্ত, আমরা নিত্যবস্তু না পাইয়া কিছুতেই সন্তুষ্ট হইতে পারি না। এই প্রভেদ যেমন ধর্মে, দর্শনে, সাহিত্যে, তেমনই চিত্রবিদ্যায় ও স্থাপত্যবিদ্যায় সর্বত্রই প্রকাশ পায়।"

কিন্তু, শ্রীঅরবিন্দের জীবনে কেমনতরো প্রারম্ভের কেমনতরো পরিণতি! শ্রীঅরবিন্দের জন্মের পর থেকেই তাঁর পিতা অতি যত্নের সঙ্গে ভারতীয় সকল কিছুর সঙ্গে তাঁর সংস্রব বাঁচিয়ে তাঁকে সম্পূর্ণ আলাদা ক'রে রাখলেন, দেশের আবহাওয়া থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে সুদূর বিলাতে রেখে তাঁকে মানুষ করলেন, তিনি চেয়েছিলেন যে, তাঁর এই ছেলেটি হবে সকল বিষয়ে পুরাদস্তুর সাহেব। কিন্তু সেই ছেলে কিনা শেষ পর্যন্ত হয়ে পড়ল সকল বিষয়ে পুরাদস্তুর ভারতীয়! তাঁর মুখের কথার কেবল উচ্চারণটা ইংরেজের মতো হ'লে কি হয়, অন্তঃকরণটা হলো একেবারেই ভারতের। একেই বলে বিধিলিপি।

ভারতের সবই ভালো

এখানকার সব কিছু পড়ে শুনে শ্রীঅরবিন্দের এই অভিমত দাঁড়িয়ে গেল যে, ভারতের সব কিছুই ভালো। এখানকার শাস্ত্র পুরাণাদি ও কাব্য সাহিত্যাদি তো ভালোই, এখানকার মানুষদের সরল বিশ্বাস জিনিসটাও ভালো। এখানকার লোকে জ্যোতিষে বিশ্বাস করে, সেটাও নিতান্ত অর্থহীন নয়। মানুষের জীবনে যে আকাশের গ্রহ, নক্ষত্রের একটা প্রভাব থাকবে এটা সঙ্গত, কারণ উপরকার সঙ্গে নিচেকার একটা নিরন্তরের যোগাযোগ রয়েছে, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ মেলে। এমন কি, তিনি জন্মান্তর এবং ভূতও বিশ্বাস করলেন। কেউ জিজ্ঞাসা করেছিল,—"আপনি এত জ্ঞানসঞ্চয় ক'রেও ভূত বিশ্বাস করেন?" তাতে তিনি হেসে বলেছিলেন,—"ভগবানের রাজ্যে এতই আশ্চর্য ব্যাপার যখন রয়েছে, তখন ভূত থাকতে পারবে না কেন?" প্রথমে তিনি দেবতায় বিশ্বাস করতেন না, তার পরে দুটো বিশেষ ঘটনাতে তাঁর দেবতাতেও বিশ্বাস জন্মে গেল। একদিন নর্মদা নদীর তীরে একটি কালী মন্দিরে ঢুকে প্রতিমার দিকে চেয়ে দেখেন যে, সেই পাষাণের প্রতিমা হঠাৎ প্রাণময়ী হয়ে উঠেছে, তার মুখে-চোখে প্রাণের স্পন্দন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আর একবার তিনি ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে কোথায় যাচ্ছিলেন, হঠাৎ একটা দুর্ঘটনায় গাড়িসমেত উল্টে তিনি এক গভীর খাদের মধ্যে গিয়ে পড়েন। এ অবস্থায় তাঁর বাঁচবার কোনোই সম্ভাবনা ছিল না, অতখানি নিচে পড়ে গিয়ে তাঁর হাড়গোড় চূর্ণ হয়ে যাবার কথা। কিন্তু মাটিতে পড়বার আগেই তিনি দেখলেন, তাঁর নিজের দেহের ভিতর থেকে কোনো এক দেবতা বেরিয়ে এসে

তাঁকে কোলে ধরে নিয়ে আর এমন যত্নে তাঁকে মাটির উপর শুইয়ে দিলে যে, গায়ে কোনো আঁচড়টি পর্যন্ত লাগল না। গাড়িটা কিন্তু ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। এর থেকে তাঁর দেবতায় বিশ্বাসটাও এসে গেল। তিনি বলতেন, দেবতারা ভগবানেরই নানা শক্তির প্রতিফলন স্বরূপ। এটি তাঁর নিজের মুখের কথা। এ-সব কথা আমরা জন্মাবধি শুনেও থাকি এবং সংস্কারগত ভাবে বিশ্বাসও করি, কিন্তু সে হ'ল আমাদের ঘুমন্ত বিশ্বাস। আর ইউরোপ থেকে শ্রীঅরবিন্দ পূর্ণ জ্ঞানবুদ্ধি নিয়ে একেবারে যৌবনকালে এসে এই সব কথা শুনলেন ও অনুভবে জানলেন, তাঁর সেই বিশ্বাস হ'ল সংস্কার-বিহীন জাগন্ত বিশ্বাস।

কিন্তু ইউরোপের সবই মন্দ নয়

কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইউরোপের সব কিছু খারাপ এমন কথা তিনি কখনই বলেননি। তিনি বরাবরই ব'লে এসেছেন যে, ইউরোপের অনেক জিনিসই ভালো আছে, সেগুলিকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে। ওরা মানবশক্তির এমন কতকগুলি দিকের উৎকর্ষ সাধন করেছে যার সম্যক্ চর্চা করা হয়নি ব'লেই আমাদের দেশের মানুষদের আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভ হওয়া সত্ত্বেও পূর্ণাঙ্গ পরিণতি হ'তে পারেনি (এই "পূর্ণাঙ্গ" [integral] কথাটি তিনি প্রায়ই ব্যবহার করতেন)। মানুষের পূর্ণাঙ্গ পরিণতি আনতে হ'লে ছুটো দিকেরই সমুচিত অনুশীলন করতে হবে। আমাদের দেশের যা বিশেষত্ব, অর্থাৎ অন্তরের দিকে দেখতে শেখা, মনের উপরকার স্তরে উঠে যাওয়া, আধ্যাত্মিক জ্ঞানের চর্চা করা, দার্শনিকতা, বিশ্বাস ও ভক্তির চর্চা,

এগুলিও যেমন দরকার,—তেমনি আবার ওদের দেশের যা বিশেষত্ব, অর্থাৎ সায়ান্সের চর্চা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রমাণ-প্রয়োগের দ্বারা সত্যাসত্যের নির্ণয়, সকল বিষয়ে নিরপেক্ষ ও নিখুঁত বিচার, বস্তুকে স্থূল বাস্তব ব'লে উড়িয়ে না দিয়ে সব কিছুকেই তার যথাযথ মূল্য দেওয়া, এগুলিও তেমনি দরকার। প্রকৃতপক্ষে দুই তরফেরই জ্ঞান সঞ্চয় ক'রে সবগুলিকে সুসঙ্গতভাবে মিশিয়ে নিয়ে তাঁর জীবনে এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল। তাকে তাঁর ভাষাতেই পূর্ণাঙ্গ সমন্বয় বলা যেতে পারে। শ্রীঅরবিন্দের যা কিছু তত্ত্ব এবং উপলব্ধি তা এই সমন্বয়ের ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

দেশের কাজ শুরু

প্রায় চব্বিশ বছর বয়স হবার পর থেকে আবার তিনি তাঁর সেই দেশোদ্ধারের ব্রতপালনের কাজ রীতিমতভাবে শুরু করলেন। কিন্তু এবার আর প্রকাশ্যে লেখালেখি ক'রে নয়, এই কাজের জন্য তিনি তলে তলে একনিষ্ঠ দেশসেবকদের একটা দল গড়ে তুলতে লাগলেন। তিনি দেখলেন যে, এ কাজে তিনি একাই নামেননি, ইতিপূর্বে উদয়-পুরের ঠাকুর সাহেবও পুণাতে এক বিপ্লববাদী দল গড়ে তুলেছেন, এবং স্থানীয় সৈন্যদের মধ্যে বিপ্লববাদ প্রচার করছেন। তা ছাড়া, মহারাষ্ট্রের লোকমান্য তিলকও তাঁর নিজের ছাত্রদের মধ্যে বিপ্লববাদ প্রচার করছেন। বরোদায় থেকে শ্রীঅরবিন্দও এই ধরনের কাজ শুরু ক'রে দিলেন। তাঁর কলেজের ছাত্রেরা তাঁকে দেবতার মতোই ভক্তি করত, অধিকাংশই ছিল তাঁর একান্ত অনুগত। তাদের সঙ্গে তিনি খুবই মিশতেন, তাদের প্রত্যেক সভাসমিতিতে নিজে গিয়ে

যোগদান করতেন। তাদের নিয়ে প্রথমে তিনি "তরুণ সংঘ" নামে এক ছাত্রদল গড়ে তুললেন। সেখানে স্বদেশপ্রেম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে গিয়ে তিনি স্পষ্টই বলতে থাকলেন যে, বিদেশীর কাছে ভিক্ষা চেয়ে কোনো ফল হবে না, নিজের স্বার্থের হানি ক'রে কেউ কাউকে ভিক্ষা দিয়ে বড়ো করে না, আর তাতে কোনো মর্যাদাও থাকে না। স্বাধীনতা ভারী দামী জিনিস, প্রাণপণে লড়ে ও প্রয়োজন হ'লে বুকের রক্ত দিয়ে তা আদায় ক'রে নিতে হয়। তার জন্য চাই দৈহিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক শক্তি। সব চেয়ে আগে আমাদের এই শক্তি জিনিসটাকে সংগ্রহ করতে হবে। তার জন্য আগে আমাদের মজ্জাগত ভীরুতা ছেড়ে নির্ভীক হ'তে হবে।

এই সময়ে মহারাষ্ট্রে দামোদর চাপেকার নামক এক বিপ্লববাদীর, সাহেব হত্যার অপরাধে ফাঁসি হয় এবং তাঁর বিপ্লবীর দলটি ভেঙে যায়। তখন সেই দল ও পুণার দল ও তরুণ সংঘ সবগুলি মিলে এক হয়ে যায় এবং শ্রীঅরবিন্দের উপরেই তার নেতৃত্বের ভার পড়ে।

শক্তিলাভের পরিকল্পনা

তিনি তখন স্থির করলেন যে, দেশের যুবকদের আগে শিক্ষা দিতে হবে, নানাভাবে দৈহিক ও মানসিক শক্তি অর্জন করতে। এই হ'ল তাঁর প্রথম পরিকল্পনা। দেশের প্রকৃত কাজ করতে হ'লে দেহে ও মনে শক্তি চাই। অন্যান্য পরাধীন জাতি যারাই মুক্তিসংগ্রামে জয়ী হয়েছে তাদের মধ্যে যথেষ্ট শক্তি ছিল, দেহেরও শক্তি এবং মনেরও বল। কিন্তু এ দেশে তার খুবই অভাব। এখানে রাজশক্তি অতি প্রবল, প্রজারা দেহেও দুর্বল আর মনেও দুর্বল। এখানে বিদেশী

রাজশক্তির চেয়েও একটা কিছু বড়ো রকমের শক্তির দরকার। সে শক্তি কিসে আসতে পারে? তা সম্ভব কেবল শক্তির যিনি মূল সেই শক্তিস্বরূপিণী মায়ের সাধনা করলে। এর থেকেই এল তাঁর "ভবানী মন্দিরের" পরিকল্পনা। এ পরিকল্পনাতে শ্রীঅরবিন্দের ছোটো ভাই বারীন্দ্রেরই বেশি সক্রিয় অংশ ছিল। তিনি তখন বরোদায় এসে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে এই কাজে যোগ দিয়েছেন।

"ভবানী মন্দির"

এই পরিকল্পনাকে বাস্তবে দাঁড় করানো হ'ল কতকটা "আনন্দ-মঠের" অনুকরণে। এই নতুন জাতীয়তাবাদ সর্বত্র প্রচার করবার উদ্দেশ্যে এক পুস্তিকা রচিত হয়, তার নাম দেওয়া হয় "ভবানী মন্দির"। তাতে বলা হয় যে, আমাদের চাই সর্বশ্রেষ্ঠ ধরনের শক্তি, তার জন্য ধর্মকে ভিত্তি ক'রে শক্তিরূপিণী মা ভবানীর সাধনা করা দরকার। কোনো গোপনীয় ও দুর্গম পার্বত্য স্থানে মা ভবানীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হবে, তাঁর সন্তানেরা সেখানে একত্রিত হয়ে সাধনা ও শক্তিচর্চার দ্বারা তাঁর কাজের উপযুক্ত হবার জন্য প্রস্তুত হবে,—সে কাজ হচ্ছো ভারতের উদ্ধার। ভারতকে এই ধ্বংসমুখী পরাধীনতা থেকে মুক্ত করতেই হবে, তাতে কেবল ভারতের নয়, কিন্তু সমস্ত জগতেরই মঙ্গল হবে। স্বাধীন হ'লে তখন এই ভারতই সমগ্র জগৎকে তার সনাতন ধর্ম শিখিয়ে দেবে, আর তাতে জগতে ধর্ম ও দর্শন ও বিজ্ঞানের একটা সর্বাঙ্গীণ সামঞ্জস্য ও পরিণতি আসবে। এ-কাজের ভার মা দিয়েছেন তোমাদেরই উপর, সারা জগৎকেই তোমরা আর্যভূমি ক'রে তোলো। সে আর্যভূমি কোনো সমুদ্র পর্বত

দিয়ে সীমাবদ্ধ নয়, তার বাসিন্দা হবে জগতের সকল স্থানের সকল জাতের সকল মানব। কিন্তু তার আগে নিজেদের মুক্তি ফিরিয়ে আনো। এই পুস্তিকা গোপনে গোপনে যুবকদের মধ্যে বিতরিত হ'তে থাকল।

ভারতী বিদ্যালয়

অতঃপর এ রা নিজেরাই খুঁজে খুঁজে নর্মদাতীরে গঙ্গামঠ নামক একটা নিভৃত মঠ পেয়ে সেখানেই ভবানী মন্দিরের কেন্দ্র স্থাপন করলেন, তার নাম দেওয়া হ'ল "ভারতী বিদ্যালয়"। সেখানে শিক্ষার্থীদের আধ্যাত্মিক শিক্ষা দেবার ভার নিলেন কেশবানন্দ। বিদ্যাশিক্ষা দেবার ভার নিলেন রামভট্ট, আর বর্তমান রণনীতি ও ব্যায়াম শেখাবার ভার নিলেন মিলিটারি শিক্ষাপ্রাপ্ত একজন হাবিলদার। ছাত্রদের দুই দলে ভাগ ক'রে যুদ্ধ করতে ও লাঠি খেলতে শেখানো হ'ত। এক দল অন্য দলকে বিপুল বেগে আক্রমণ করত, কিন্তু আদেশ থাকত যে, কঠিন আঘাত পেলেও কেউ কখনো পিছু ফিরে পালাবে না। এ-শিক্ষা বেশ উৎসাহের সঙ্গেই চলতে থাকল। এখানকার ব্যয়বহন করতেন শ্রীঅরবিন্দ ও দেশপাণ্ডে প্রভৃতি তাঁর কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধু।

ক্ষত্রতেজ ও ব্রহ্মতেজ

কিন্তু ওতে এত বড়ো দেশের মধ্যে ক'টাই বা শক্তিকেন্দ্র গড়ে উঠবে আর কতটুকুই বা শক্তিসঞ্চয় হবে? প্রবল রাজশক্তিকে যে এই উপায়ে কিছুমাত্রও টলানো যাবে না, সে কথা শ্রীঅরবিন্দ বিলক্ষণ

জানেন। কেবল এতেই কিছু হ'তে পারে না, এর চেয়েও প্রবল কিছু শক্তিলাভের উপায় আমাদের করা চাই। শাস্ত্রাদিতে ঋষিরা বলেছেন যে, রাজার যে শক্তি তার নাম ক্ষত্রতেজ, কিন্তু তার চেয়েও প্রবলতর শক্তি আছে, তার নাম 'ব্রহ্মতেজ'। ব্রহ্মতেজ হ'ল স্বয়ং ব্রহ্মেরই অমোঘ তেজের অংশ। সে তেজ যোগের দ্বারা আয়ত্ত করা যায়। বিশ্বামিত্র ছিলেন ক্ষত্রিয়, তাঁর ছিল ক্ষত্রতেজ। কিন্তু বশিষ্ঠের ব্রহ্মতেজের কাছে তাঁর সমস্ত শক্তি পরাজিত হয়। তখন তিনি তপস্যা ও যোগসাধনার দ্বারা উচ্চতর ব্রহ্মতেজ লাভ করেন ও তারই দ্বারা বশিষ্ঠকে পরাজিত করেন। সেকালে এমন অনেকেই যোগের সাহায্যে ব্রহ্মতেজ লাভ করেছিলেন। যদি তিনি ঐরূপ সাফল্য চান তাহ'লে তাঁকেও আগে এই ব্রহ্মতেজ লাভ করতে হবে। নিজে সাধনার দ্বারা যদি এ তেজের অধিকারী হ'তে পারেন তাহ'লে তখন তাঁর থেকেই অন্যান্য সকলে শক্তি পেতে পারবে। এই বিশ্বাস থেকেই তিনি অতঃপর যোগসাধনা করতে বদ্ধপরিকর হ'লেন। বলা-বাহুল্য সেটা নিজের কোনো লাভের উদ্দেশ্যে নয়, কেবল ভারতের বন্ধনমুক্তির উদ্দেশ্যে। নিজের জন্য কিছুই তাঁর চাই না। নিজের জন্য কিছুই তিনি করছেন না।

যোগের প্রয়াস

যোগ সম্বন্ধে তিনি গীতা ও অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থে অনেক কথাই পড়েছেন, কিন্তু কেমন ভাবে যোগ করতে হয় তার সঠিক পদ্ধতি কিছু জানেন না। সেটা শিখে নেবার জন্য তিনি অভিজ্ঞ যোগীর সন্ধান করতে লাগলেন। নর্মদার ধারে স্থানে স্থানে অনেক যোগীদের

আশ্রম আছে, তিনি সেই সব আশ্রমে ঘুরে বেড়িয়ে কয়েকজন ভালো ভালো যোগীর সন্ধানও পেলেন। তাদের কারো কারো কাছ থেকে তিনি যোগ করবার পদ্ধতি কিছু কিছু জানতেও পারলেন। কেউ বললে প্রাণায়াম করো, তাতেই যথেষ্ট শক্তি পাবে। প্রাণায়াম করা মানে নিঃশ্বাস টেনে নিয়ে কিছুক্ষণ পর্যন্ত তাকে রুখে থাকা, তার পরে ধীরে ধীরে সেই নিঃশ্বাস ত্যাগ করা। তিনি প্রত্যহ পাঁচ ছয় ঘণ্টা যাবৎ দারুণ মেহনত ক'রে এই অভ্যাসই করতে থাকলেন। তাতে তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি ও মস্তিষ্কের উন্নতি কিছু হ'ল বটে, কিন্তু আসল কাজের কিছুই হ'ল না। তখন কেউ বললে অনেকক্ষণ পর্যন্ত চোখ বুজে ধ্যান করো, তাতেই কাজ হবে। সে চেষ্টাও তিনি করতে থাকলেন। যখন তখন তিনি স্তব্ধ হয়ে গভীর ধ্যানে রত হয়ে থাকতেন।

এই যোগ করা জিনিসটা কি? এক কথায় তা বলা কঠিন, তবে মোটের উপর তার সম্বন্ধে কিছু ধারণা এখানে দেওয়া যেতে পারে। সাধারণ পূজা-অর্চনা বা প্রার্থনা-উপাসনার সঙ্গে এর অনেকখানি তফাৎ। পূজা প্রভৃতির উদ্দেশ্য ভগবানকে বা ইষ্টদেবতাকে তুষ্ট করা, কিন্তু যোগের উদ্দেশ্য ভগবানের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত এবং মিলিত ক'রে দেওয়া। পূজা প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া করে মানুষ শুধু নির্দিষ্ট একটা সময়ে বা কিছুক্ষণের জন্য। কিন্তু যোগের কাজ সর্বক্ষণের জন্য, তার কোনো বিরাম নেই। যোগের একমাত্র লক্ষ্যই থাকবে ভগবানের চেতনার সঙ্গে নিজের চেতনাকে এক ক'রে দেওয়া। এরূপ যোগ যে হয়েছে তা নিজেই টের পাওয়া যাবে এবং তা সর্বক্ষণের জন্য স্থায়ী হবে, তবেই এর সিদ্ধি। কেমন উপায়ে তা

সম্ভব? শাস্ত্রে বলেছে, চিত্তবৃত্তির নিরোধের দ্বারা, অর্থাৎ মনকে সব দিক থেকে গুটিয়ে এনে একমাত্র লক্ষ্যের দিকে সর্বক্ষণ নিযুক্ত রাখতে চেষ্টা করা। আসলে এ কেবল মনের কাজ, চোখে দেখবার কিছু নেই। চোখ চেয়ে থেকেও যোগের সাধনা করা চলে, কাজ করতে করতেও চলে। বাইরের মন বাইরের কাজে ব্যস্ত থাকবে, কিন্তু ভিতরের মন সর্বক্ষণ ঐ কাজেই নিযুক্ত থাকবে। অভ্যাসের দ্বারা এটা করতে পারা যায়। শ্রীঅরবিন্দ সেই অভ্যাস করতে থাকলেন, কিন্তু আপাতত তার কোনো বিশেষ রকমের ফল হ'তে দেখলেন না।

অতএব দেখা যায় যে, ঐ সময়টাতে তিনি প্রফেসরির চাকরি করতে করতে আরো তিন রকম ব্যাপারে নিযুক্ত ছিলেন—জ্ঞানার্জন, বিপ্লবীদের দল গঠন, আর যোগসাধনা।

ঐ সময়ে তিনি ফাঁক পেলে কাব্য রচনাতেও নিযুক্ত থাকতেন। রামায়ণ ও মহাভারতের অংশবিশেষ অনুবাদ করার কথা আগেই বলা হয়েছে। তা ছাড়াও, তিনি উৎকৃষ্ট ধরনের অনেক মৌলিক কবিতা ইংরেজীতে লিখতেন। সেগুলি দুখানি বই হয়ে প্রকাশিত হয় অনেক পরে।

বিবাহ

১৯০১ সালে উনত্রিশ বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়। দেশের কাজে যখন জীবন উৎসর্গ করেছেন, বিপ্লবের মধ্যে যখন ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছেন, তখন তাঁর বিবাহ ক'রে নিজেকে সাংসারিক ব্যাপারে

জড়ানো উচিত কি-না একথা তিনি নিশ্চয় ভেবেছিলেন। কিন্তু একটা কাজ করতে গেলে যে অন্য একটা কাজ করবেন না, এমন ধরনের নীতি তাঁর কখনই ছিল না। আমাদের দেশের নিয়ম অনুযায়ী গার্হস্থ্যধর্মও একটা ধর্ম, আগেকার ঋষিরাও এ ধর্ম পালন করতেন। সকল দিক ভেবেই তিনি বিবাহ করতে রাজী হ'ন। ঐ সময়ে বিবাহের একটা যোগাযোগও ঘটে গেল। রাঁচি নিবাসী শ্রীভূপালচন্দ্র বসুর একটি সুন্দরী ও বিদুষী কন্যা মৃণালিনীকে শ্রীঅরবিন্দ খাঁটী হিন্দু মতেই বিবাহ করেন।

শ্রীঅরবিন্দ বিলাত গিয়েছিলেন ব'লে বিবাহের সময় তাঁর প্রায়শ্চিত্ত করবার কথা উঠেছিল, কারণ সেকালে তাই নিয়ম ছিল। কিন্তু তিনি তাতে রাজী হননি, বললেন বিলাতে যাওয়া কোনো একটা অপরাধ নয়।

মৃণালিনী ছিলেন সরল প্রকৃতির নারী। তবে ব্রাহ্মদের সংস্রবে থেকে ও আধুনিক শিক্ষা পেয়ে তিনি একটু শৌখীন ছিলেন। দুজনের মধ্যে অন্তরের প্রীতি যথেষ্টই হয়েছিল। কিন্তু বেশিদিন তাঁর স্বামীর সঙ্গে একত্রে থাকার সুযোগ হয়নি। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর লেখাপড়া ও দেশের কাজ নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতেন, মৃণালিনী মাঝে মাঝে স্বামীর কাছে আর মাঝে মাঝে তাঁর পিত্রালয়ে বা দেওঘরে থাকতেন। শ্রীঅরবিন্দ তাঁকে নিজের কাজের ও সাধনার সহযোগিনী ক'রে নেবার অনেক চেষ্টা করেছিলেন। দূরে থাকলে মাঝে মাঝে তাঁকে চিঠি লিখতেন, তার মধ্যে তিনখানি চিঠি পরে পুলিশের হস্তগত হয় ও পরে "স্ত্রীর পত্র" নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়ে বিখ্যাত হয়েছে। সেই চিঠিগুলি পড়লে

তাঁর তখনকার মনের অবস্থা পরিষ্কাররূপে বোঝা যায়। তার মধ্যে একখানি চিঠিতে আছে :

"...এখন কথাটা এই, তুমি হিন্দুধর্মের পথ ধরিবে না নূতন সভ্যধর্মের পথ ধরিবে? পাগলকে বিবাহ করিয়াছ সে তোমার পূর্বজন্মার্জিত কর্মদোষের ফল। নিজের ভাগ্যের সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করা ভাল, সে কি রকম বন্দোবস্ত হইবে?...হাজার ব্রাহ্মস্কুলে পড়িয়া থাক তবু তুমি হিন্দুর ঘরের মেয়ে, হিন্দু পূর্বপুরুষের রক্ত তোমার শরীরে, আমার সন্দেহ নাই তুমি হিন্দুধর্মের পথই ধরিবে।

"আমার তিনটি পাগলামী আছে। প্রথম পাগলামী এই, আমার দৃঢ়-বিশ্বাস ভগবান যে গুণ, যে প্রতিভা, যে উচ্চশিক্ষা ও বিদ্যা, যে ধন দিয়াছেন সবই ভগবানের। যাহা পরিবারের ভরণপোষণে লাগে আর যাহা নিতান্ত আবশ্যকীয়, তাহাই নিজের জন্য খরচ করিবার অধিকার, যাহা বাকি রহিল ভগবানকে ফেরত দেওয়া উচিত।...

"দ্বিতীয় পাগলামী সম্প্রতিই ঘাড়ে চেপেছে। পাগলামীটা এই, যে-কোন মতে ভগবানের সাক্ষাদ্দর্শন লাভ করিতে হইবে।...ঈশ্বর যদি থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার অস্তিত্ব অনুভব করিবার, তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার কোন না কোন পথ থাকিবে, সে পথ যতই দুর্গম হোক আমি সে পথে যাইবার দৃঢ়সংকল্প করিয়া বসিয়াছি।...

"তৃতীয় পাগলামী এই যে, স্বদেশকে অন্য লোকে একটা জড়পদার্থ, কতগুলা মাঠ-ক্ষেত্র-বন-পর্বত-নদী বলিয়া জানে; আমি স্বদেশকে 'মা' বলিয়া জানি, ভক্তি করি, পূজা করি। মার বুকের উপর বসিয়া যদি একটা রাক্ষস রক্তপানে উদ্যত, তাহা হইলে ছেলে কি করে? নিশ্চিন্তভাবে আহার করিতে বসে, স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে আমোদ করিতে বসে, না মাকে উদ্ধার করিতে দৌড়াইয়া যায়? আমি জানি এই পতিত জাতিকে উদ্ধার করিবার বল আমার

পায়ে আছে, শারীরিক বল নয়, তরবারি বা বন্দুক নিয়া আমি যুদ্ধ করিতে যাইতেছি না, জ্ঞানের বল। ক্ষত্রতেজ একমাত্র তেজ নহে ব্রহ্মতেজও আছে, সেই তেজ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ভাব নূতন নহে, আজকালকার নহে, এই ভাব নিয়া আমি জন্মিয়াছিলাম, এই ভাব আমার মজ্জাগত, ভগবান এই মহাব্রত সাধন করিতে আমাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সে বীজটা অঙ্কুরিত হইতে লাগিল, আঠার বৎসর বয়সে প্রতিষ্ঠা দৃঢ় ও অচল হইয়াছিল।...

"এখন বলি এ বিষয়ে তুমি কি করিতে চাও? স্ত্রী স্বামীর শক্তি, তুমি উষার শিষ্যা হইয়া সাহেবপূজা মন্ত্র জপ করিবে? উদাসীন হইয়া স্বামীর শক্তি খর্ব করিবে? না সহানুভূতি ও উৎসাহ দ্বিগুণিত করিবে?..."

এই চিঠি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় তিনি তখন নিজের সংকল্পের পথে দৃঢ়পদে চলে কতখানি অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁর এই বিশেষ তিনটি পাগলামীর কথা পরে সর্বজনবিদিত হয়েছিল।

বাংলায় নিষ্ফল প্রচেষ্টা

বিবাহের উপলক্ষে শ্রীঅরবিন্দ যখন কলকাতায় আসেন তখন তিনি বাংলাদেশের চারিদিক ঘুরে একবার দেখে নিলেন যে, এখানকার রাজনৈতিক আন্দোলনের ভাবগতিক কেমন। তিনি দেখলেন যে, বাংলাতে রাজনীতি থাকলেও প্রকৃত জাতীয় জাগরণের কোনো সাড়াশব্দই নেই। সকলেই যেন নিশ্চিন্ত নিদ্রাঘোরে মগ্ন। অথচ এই বাংলাদেশেরই আগে জেগে ওঠা দরকার, নতুবা দেশোদ্ধারের জোরালো কোনো কাজ হবে না। এখানে বৈদ্যুতিক শক্তির স্ফুলিঙ্গ আছে, এখানেই "বন্দে মাতরম্" মন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছিল।

তিনি এখানকার পাঁচজন ভালো ভালো লোকের কাছে সেই মন্ত্রের মর্মের কথা শোনাতে লাগলেন, বিপ্লববাদের কথাও বলতে লাগলেন। শুনে সবাই যেন আশ্চর্য হয়ে গেল। এমন আজগুবি কথা বলাতে অনেকে তাঁকে বাতুল ব'লেই মনে করলে। হাতে যাদের অস্ত্র নেই, দেহে যাদের বল নেই, তারা ঐ দুর্ধর্ষ ইংরেজ জাতকে কেবল মুখের জোরে কিংবা গালে চড় মেরে তাড়াবে নাকি? শ্রীঅরবিন্দ বুঝিয়ে বললেন যে, লড়াই করবার অস্ত্রাদি তো বাইরের থেকেও এনে ফেলা যায়। ভারতের মতো এত বড়ো দেশটাকে শাসন করছে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ইংরেজ আমলা, তাদের সহায় মাত্র কয়েক হাজার গোরা পল্টন, বাকী সমস্ত সৈন্যরাই ভারতের লোক। এই সব দেশী সৈন্যকে অনায়াসে নিজেদের দলে টেনে নেওয়া যায়, গেরিলা যুদ্ধ ক'রে অনায়াসেই রাজশক্তিকে বিপর্যস্ত করা যায়। তিনি আরো বললেন যে, ব্রিটিশ জাতটাকে তিনি ভালো ক'রেই চেনেন; রাজ্যশাসনের ক্ষমতা চাইলে তারা কিছুতেই তা আমাদের হাতে তুলে দেবে না, কিন্তু দেশের লোকের মনে স্বাধীনতা লাভের দৃঢ়সংকল্প জেগেছে দেখলে ও বিপ্লবের সূচনা দেখলে তখন তারা আপনা থেকেই একটা আপোষে আসতে চাইবে, কিংবা তেমন তেমন অবস্থা দেখলে রাজ্যশাসনের অধিকারটাও আমাদের হাতে ছেড়ে দেবে। অতএব শেষ পর্যন্ত তাদের সঙ্গে লড়াই করবার দরকারই হবে না, আমাদের তরফের রীতিমত সংগ্রামের আয়োজন দেখলেই তারা সরে যাবে।

কিন্তু বাংলাদেশের লোক তাঁর এ কথায় সায় দিলে না, তাঁর মন্ত্রটি গ্রহণ করতে তারা সাহসই করলে না। মাত্র জনকয়েক তাঁর

ডাকে তখন সাড়া দিয়েছিল। তার মধ্যে ছিলেন ব্যারিস্টার প্রমথ মিত্র, ঠাকুরবাড়ির সরলা দেবী, মেদিনীপুরের সত্যেন্দ্র বসু।

"অনুশীলন সমিতি"

অতঃপর তিনি বরোদায় ফিরলেন। সেখান থেকে তিনি স্থির করলেন যে, ওতে হবে না, তলে তলে আগে বাংলার যুবকদের জাগিয়ে তুলতে হবে, স্থানে স্থানে তাদের নিয়ে দল গঠন করতে হবে। তার জন্য প্রথমেই তিনি নব আদর্শে উদ্দীপিত বিপ্লবী কর্মী যুবকদের একটি দল তৈরি করবার উপায় খুঁজতে লাগলেন। সে সময়ে সৈন্যবিভাগে বরোদায় ছিলেন শ্রীযতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (বাঘা যতীন নয়) নামে এক উচ্চমনা যুবক। তৎকালে বাঙালীকে সৈন্যবিভাগে নেওয়া হ'ত না, কিন্তু যতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐ বিভাগেই ঢোকবার অত্যন্ত বাসনা হওয়াতে তিনি শ্রীঅরবিন্দের কাছে বিশেষ অনুরোধ করেন, এবং শ্রীঅরবিন্দ তাঁকে যতীন্দ্র উপাধ্যায় নাম দিয়ে কোনো এক বন্ধুর সাহায্যে বরোদার সৈন্য-বিভাগে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। অতঃপর তাঁকে তিনি নিজের বিপ্লব-মন্ত্রেও দীক্ষিত করেছিলেন। এখন তাঁকেই তিনি বললেন বাংলায় গিয়ে বাছা বাছা যুবকদের নিয়ে একটি গুপ্ত সমিতি গড়ে তুলতে। তাঁকে এই বিষয়ে সাহায্য করবার জন্য ব্যারিস্টার প্রমথ মিত্র ও সরলা দেবীর কাছে তিনি চিঠিও দিয়ে দিলেন। যতীন্দ্রের পরে তিনি তাঁর নিজের ভাই বারীন্দ্রকেও এই কাজের জন্য বাংলায় পাঠালেন। এঁরা প্রথমেই একজন যুবককে এঁদের দলভুক্ত করেন, তাঁর নাম শ্রীঅবিনাশ ভট্টাচার্য। এই তিনজনকে নিয়ে কলকাতায়

প্রথম "অনুশীলন সমিতি" স্থাপিত হয়, ব্যারিস্টার প্রমথ মিত্র হ'লেন তার উদ্যোক্তা। ক্রমে অনেক যুবক এই দলে এসে ভিড়তে থাকে। বাহ্যত তাদের ব্যায়াম, লাঠিখেলা, ঘোড়ায় চড়া প্রভৃতি শেখানো হ'ত, কিন্তু ভিতরে ভিতরে বিপ্লবের দ্বারা দেশোদ্ধারের আদর্শে তাদের অনুপ্রাণিত করা হ'ত। মুসলমান যুবকেরাও এদের মধ্যে স্থান পেত। শ্রীঅরবিন্দ মাঝে মাঝে এসে যথাকর্তব্য নির্দেশ দিয়ে যেতেন।

ক্রমে ক্রমে কলকাতাতেই এবং বাংলাদেশের আরো কোনো কোনো জেলাতে বহু শাখাসমিতি গজিয়ে উঠতে থাকল। তার মধ্যে মেদিনীপুরের গুপ্ত কেন্দ্রটি সবচেয়ে বেশি অগ্রসর হয়েছিল। সেখানে বন্দুক চালনা ও পিস্তল চালনা প্রভৃতিও শিক্ষা দেওয়া হ'ত। শ্রীঅরবিন্দ স্বয়ং গিয়ে কাউকে কাউকে বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষা দিতেন। দীক্ষা নেবার সময় তাদের এক হাতে থাকত তরবারি আর অন্য হাতে থাকত গীতা, তারা দেশমাতার মুক্তির জন্য নিজেদের জীবনপণের প্রতিজ্ঞা করত।

বহু শাখাসমিতির সৃষ্টি হওয়াতে কলকাতায় তার একটি মূল কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ব্যবস্থা হয় যে, এই কেন্দ্রের নির্দেশেই সারা দেশের গুপ্তসমিতির সকলে চলবে। এই কেন্দ্রের পরিচালক ছিলেন পাঁচজন সদস্য, তাঁদের মধ্যে ছিলেন ব্যারিস্টার প্রমথ মিত্র ও সিস্টার নিবেদিতা। অবশ্য শ্রীঅরবিন্দই ছিলেন প্রধান। তিনি যা কিছু উপার্জন করতেন তা এইখানে পাঠিয়ে দিতেন। শ্রীঅরবিন্দের পরিকল্পনা এই ছিল যে, সমগ্র বাংলাদেশকে মোট ছয়টি শাখাকেন্দ্রে বিভক্ত করা হবে, তারও প্রত্যেকটির আবার অন্তর্বিভাগ থাকবে

সেই সব কেন্দ্রে গেরিলা যুদ্ধের কৌশল শেখানো হবে। এই ধরনের বিপ্লবাত্মক রণনীতি শিখে আসবার জন্য ও বোমা প্রস্তুত প্রণালী শিখবার জন্য কয়েকজনকে ইউরোপেও পাঠানো হ'ল। শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন যে, এইভাবে চারিদিকের সমস্ত দলগুলিকে চারিদিক থেকে একযোগে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ক'রে তুলতে প্রায় ত্রিশ বছর সময় লাগবে। অর্থেরও অনেক প্রয়োজন, কিন্তু অর্থের অভাব হ'ত না। অনেক ধনী ব্যক্তি তখন গোপনে গোপনে এঁদের অর্থসাহায্য করতেন।

"স্বরাজ" ও "দেশের কথা"

দেশের লোকের সহানুভূতি আকর্ষণ করাতে ও দলীয় লোকের সংখ্যা আরো বাড়াতে শ্রীঅরবিন্দ আর এক উপায় অবলম্বন করলেন। তাঁর ভাই বারীন্দ্রকে তিনি বললেন, কোনো শক্তিমান লেখককে দিয়ে দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্দশার একটি জ্বলন্ত বর্ণনা-পূর্ণ বই লিখিয়ে তা খুব সস্তা দামে দেশের লোককে বিলি করতে হবে। বারীন্দ্র বললেন, তখনকার "হিতবাদী" পত্রিকার সহ-সম্পাদক সখারাম গণেশ দেউস্কর এ কাজের পক্ষে খুবই উপযুক্ত। ইনিই প্রথম "স্বরাজ" কথাটি আবিষ্কার করেন। এঁকে অনুরোধ করায় ইনি অল্পকালের মধ্যেই "দেশের কথা" নামে ঐরূপ একটি বই লিখে দিলেন। ছাপা হয়ে প্রকাশিত হওয়া মাত্রই এ বইএর প্রচুর কাটতি হ'তে থাকল। বাংলার যুবকেরা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে এ বই পড়তে লাগল এবং হাতে হাতে তা সকলেরই কাছে প্রচারিত হ'তে থাকল। নিজেদের দেশের প্রকৃত অবস্থার বিবরণ পড়ে সকলেরই

মনে একটা অকৃত্রিম দেশাত্মবোধ জেগে উঠল। এই বইখানি বাংলাদেশে নবজাগরণের জোয়ার বইয়ে দিতে যথেষ্টই সাহায্য করেছিল। এতে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই একটা ঘনিষ্ঠ একতার সূত্রে আবদ্ধ হ'তে থাকল। ব্যাপারটা এমন দাঁড়াল যে, শাসনকর্তারা তাতে চিন্তান্বিত হয়ে উঠল। হিন্দু ও মুসলমানে সম্প্রীতি ও একতা তারা কেউই পছন্দ করে না, দুই সম্প্রদায়কে বিভক্ত রেখে শাসন করাই তাদের বিশেষ নীতি। কেমন ভাবে এটি নিবারণ করা যায় সেই উপায় তারা খুঁজতে লাগল।

দেশ বিভাগের ফন্দি

এই সময় লর্ড কার্জন ভারতের বড়লাট হয়ে কলকাতায় আসেন। তিনি এসে এখানকার পরিস্থিতিটা দেখে খুশি হলেন না। এখানকার লোকেরা ইংরেজী বিদ্যার শিক্ষা পেয়ে রীতিমত চালাক হয়ে উঠেছে, বাঙালী যুবকেরা দলে দলে নিজেদের কতরকম সমিতি গঠন করছে, তার উপরে আবার হিন্দু-মুসলমানে মিলে যাচ্ছে। এর কিছু প্রতিকার করা এখনই দরকার, হিন্দু ও মুসলমানকে পৃথক রাখা খুবই দরকার। বাংলাদেশকে এমন ভাবে দুই ভাগে ভাগ ক'রে ফেলা যাক যাতে পূর্ব দিকে থাকবে মুসলমানদের প্রাধান্য, আর পশ্চিম দিকে থাকবে হিন্দুদের,—এই দুটি ভাগকে আলাদা আলাদা প্রদেশ হিসাবে শাসন করা হবে, তাহ'লে আর এরা মিলতে পারবে না। নতুবা ঐভাবে মিলে থাকলেই এদের তেজ বেড়ে যাবে। তিনি বিলাতে এই প্রস্তাব ক'রে পাঠালেন এবং অবিলম্বেই তা অনুমোদিত হ'ল।

শ্রীঅরবিন্দের প্রতিক্রিয়া

বরোদা থেকে এই খবর শুনেই শ্রীঅরবিন্দ লিখে পাঠালেন, —ঠিকই হয়েছে, এই আমাদের সুবর্ণ সুযোগ। গুরুতর কোনো আঘাত না পেলে মানুষের চেতনা আসে না। ওরা আমাদের ভাই ভাইকে ঠাঁই ঠাঁই ক'রে দিতে চাইছে, এবার এই দেশবিভাগের আঘাতটার ভিতর দিয়েই আমাদের স্বাধীনতার আন্দোলনকে উদ্দীপিত ক'রে তুলতে হবে। পরে তিনি নিজেই ছুটি নিয়ে এসে কলকাতায় এক বিরাট প্রতিবাদ সভার আয়োজন করলেন। নিজে রইলেন আড়ালে, কিন্তু শহরের নামজাদা ব্যক্তিদের দিয়ে সভায় একটি নূতন রকমের গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব অনুমোদন করিয়ে নিলেন। এর নাম হ'ল "স্বদেশী প্রস্তাব"। তাতে বলা হ'ল যে, ইংরেজের কুশাসনে দেশের চরম দুর্দশা ঘটেছে. এর একটা প্রতিবিধান আমরা করতে চাই। তাই আজ থেকে আমরা প্রতিজ্ঞা করলাম যে, বিলাতী কোনো জিনিস আমরা কিনব না, ছোঁবো না। আর নিজেদের দেশের শিল্পের যাতে উন্নতি হয়, সেজন্যে আমরা পারতপক্ষে আমাদের দেশে তৈরি দেশী জিনিসই ব্যবহার করব। আর ওদের আইন-আদালতেও আমাদের কাজ নেই, আমাদের মামলা-মোকদ্দমার বিচারের ব্যবস্থা আমরা নিজেরাই করব। আর ওদের স্কুল-কলেজেও আমাদের ছেলেমেয়েদের পড়াব না, নিজেরা জাতীয় স্কুল-কলেজ খুলব, সেখানেই তারা পড়বে। এই চার রকম উপায় সবাই মিলে অবলম্বন করলেই ওরা জব্দ হবে। এই প্রস্তাব সর্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হ'ল।

সক্রিয় অসহযোগ আন্দোলন

এই প্রথম বাংলাদেশে শুরু হ'ল অসহযোগ আন্দোলন। এটা ঠিক গান্ধীজীর আদর্শের অহিংস অসহযোগ নয়। এর উদ্দেশ্য ছিল যে, ওদের শাসন-ব্যবস্থাকে না মেনে আমরা তার পাশাপাশি নিজেদের আলাদা একটা শাসন-ব্যবস্থা দাঁড় করাব, অর্থাৎ ওদের প্রভুত্বকে গ্রাহ্য করব না। কিন্তু তাতেও যদি ওরা জব্দ না হয় তাহ'লে তখন বিদ্রোহ ক'রে গেরিলা যুদ্ধে নামতে হবে, সে ব্যবস্থাও তলে তলে হ'তে থাকল। তবে এটা আমরা বিদ্বেষ ক'রে করছি না, প্রয়োজনের জন্যেই করতে হচ্ছে। শ্রীঅরবিন্দ এ বিষয়ে পরে স্পষ্ট ক'রেই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন :

"আমাদের এই স্বরাজ সংকল্পের মধ্যে অন্য জাতির উপর বা তাদের শাসনতন্ত্রের উপর কোনো আক্রোশ নেই। আমরা চাই শুধু আমলাতন্ত্রের বদলে প্রজাতন্ত্র, বিদেশী কর্তৃত্বের বদলে স্বদেশী কর্তৃত্ব। এটা স্বাভাবিক ইচ্ছা, এর মধ্যে কোনো ঘৃণাবিদ্বেষ নেই। এর মূলে রয়েছে প্রেম ও সৌভ্রাত্র, নিজেদের মধ্যে ঐক্য এলে আমরা তখন সমগ্র মানবজাতির মধ্যে ঐক্য কামনা করব, সকল জাতির সঙ্গে এক হয়ে মিশব। কিন্তু সে মিলন হবে সমানে সমানে, সে মিলন হবে ভাইএ ভাইএ, প্রভু-ভৃত্যের বা খাদ্য-খাদকের সম্পর্ক নিয়ে সে মিলন হ'তে পারে না।"

তখন তিন দিক থেকে রীতিমতভাবে কাজ শুরু হ'ল। একদিকে গোপনে গোপনে যুবকদের দল গড়া ও ব্যাপক সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য তাদের প্রস্তুত ক'রে তোলা। আর একদিকে বহুল প্রচারের দ্বারা দেশের লোকের মনকে স্বাধীনতাকামী ক'রে তোলা—ব্রিটিশ শাসন

কিছুতে ঘুচবে না এই ভুল ধারণাটি তাদের মন থেকে তাড়ানো। আর একদিকে সকল রকম অসহযোগের দ্বারা বিদেশী শাসনতন্ত্রের ভিত্তি আল্‌গা ক'রে দেওয়া।

বাংলা বিভাগ

দেশের লোকের স্বদেশী আন্দোলনে কর্ণপাত না ক'রে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ১৯০৫ সালে বাংলাদেশকে দুটি স্বতন্ত্র প্রদেশে বিভক্ত ক'রে দিলে। এই ১৯০৫ সাল বাংলার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তখনকার এই বাংলা বিভাগের ফলে শুধু বাঙালীর নয়, সমস্ত ভারতবাসীর বহু শতাব্দীর মোহনিদ্রা এককালে ছুটে গেল। তখন থেকে রীতিমত "স্বদেশী আন্দোলন" শুরু হয়ে গেল, ভীরু বাঙালীরাও নির্ভয়ে "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি করতে শুরু করলে। স্কুল কলেজের ছেলেরা দল বেঁধে রাস্তায় রাস্তায় স্বদেশী গান গাইতে লাগল। ঐ বছর অক্টোবর মাসে যেদিন বাংলাদেশ বিভক্ত হয় সেদিন দেশের লোক উপবাস ক'রে পবিত্র হয়ে পরস্পরের হাতে রাখী বাঁধল, সেদিন "বন্দে মাতরম্" ধ্বনিতে দেশের আকাশ-বাতাস মুখরিত হ'ল। বাংলাদেশের সর্বত্র সভাসমিতি অনুষ্ঠিত ক'রে সকলে বিলাতী বর্জন ও স্বদেশী গ্রহণের প্রতিজ্ঞা করলে, বিলাতী কাপড় স্তূপাকার ক'রে আগুন লাগিয়ে পোড়ানো হ'ল। কর্তৃপক্ষের এই ভুলটিতে লোকের উত্তেজনা ও স্বাধীনতার স্পৃহা অনেক বেড়ে গেল। রবীন্দ্রনাথের "বাংলার মাটি বাংলার জল" ঐ সময়ের গান।

ভগবানের কাজ

সেই দারুণ গণ্ডগোল ও উত্তেজনার মাঝেও কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ একবারও ভগবানের কথা ভোলেন নি। তিনি বললেন:

"এ আমার বা তোমার বা তার কাজ নয়, আমি তুমি এখানে কেউই নয়, এ কাজ স্বয়ং ভগবানের। তিনিই আজ বাংলাদেশকে জাগিয়েছেন, তাঁর শক্তিই এখানে ক্রিয়া করছে। সব কিছু তিনিই করছেন, আমাদের পিছনে তিনিই রয়েছেন, এই জাতির হৃদয়েতে তিনিই অমর হয়ে বিরাজ করছেন। এই নব অভ্যুত্থানের ভিতর দিয়ে এ জাতি তাঁকেই উপলব্ধি করবে।"

কিন্তু তখনও তিনি প্রকাশ্যে অবতীর্ণ হন নি, দূরে থেকে অন্তরালেই সব কিছু করছেন। তাঁরই দেওয়া মন্ত্র সকলে গ্রহণ করেছে, তাঁরই নির্দেশে বিলাতী বর্জন ও স্বদেশী ব্রত পালন করছে, তাঁরই কথায় সবাই স্বরাজ চাইতে শুরু করেছে, কিন্তু কেউ তখনও তাঁকে ভালো ক'রে চেনেই না। দেশের সকল নেতার চেয়ে তিনি বয়সে ছোটো, তাঁদের পিছনে নিজেকে তিনি ইচ্ছা ক'রেই আড়াল ক'রে রেখেছেন। নিজের নামটা পর্যন্ত কোথাও ব্যবহার করেন না।

১৯০৫ সালের ডিসেম্বরে কাশীর কংগ্রেস অধিবেশনে তিনি আড়ালে থেকেই চেষ্টা করলেন নেতাদের দ্বারা উপরোক্ত চারটি প্রস্তাবকে কংগ্রেসের অনুমোদিত প্রস্তাবরূপে গ্রহণ করাতে। কিন্তু সেখানে নরমপন্থীদেরই প্রাধান্য, তাই কেবল বাংলা বিভাগের প্রতিবাদ ও বিলাতী বর্জন ছাড়া আর কোনো প্রস্তাব গৃহীত হ'ল না।

বরোদা ত্যাগ

এদিকে শাসনকর্তারা দেখলে যে, বাংলাদেশের যুবকেরা ক্রমশ বিদ্রোহী হয়ে উঠছে। তখন আইনের দ্বারা, নিষেধাজ্ঞার দ্বারা স্বদেশী সভাসমিতি করা ও "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি করা বন্ধ করবার ব্যবস্থা হ'ল। কিন্তু সে নিষেধাজ্ঞা কেউই গ্রাহ্য করলে না। তখন নানাস্থানে ধরপাকড় ও উৎপীড়ন চলতে থাকল।

শ্রীঅরবিন্দ দেখলেন যে, তাঁর বরোদায় বসে থাকা আর চলবে না। ১৯০৬ সালের গোড়াতেই তিনি বিনা বেতনে লম্বা ছুটি নিয়ে কলকাতায় চলে এলেন। মাঝে একবার অল্পদিনের জন্য বরোদায় ফিরে গিয়েছিলেন, কিন্তু জুলাই মাস থেকে একেবারেই বরোদা ত্যাগ করলেন। মহারাজা অনেক চেষ্টা করেছিলেন তাঁকে বরোদায় রাখতে, কলেজের ছাত্রেরাও অনেক চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তখন অন্যত্র কাজের ডাক পড়েছে। উপরের শক্তি যেদিকে চালিত করবে সেইদিকে তাঁকে যেতেই হবে।

চতুর্থ অঙ্ক

বাংলা পর্ব (চার বছর)

বরিশাল সম্মেলন

বাংলাতে এসে শ্রীঅরবিন্দ প্রথম প্রকাশ্যভাবে নেতারূপে যোগদান করলেন বরিশাল প্রাদেশিক সম্মেলনে। এই সম্মেলনে বাংলা বিভাগের প্রতিবাদ করবার কথা ছিল। সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি নেতারাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট নিষেধাজ্ঞা জারি করলে যে, ঐ সভা সেখানে করতে দেওয়া হবে না। সে আদেশ অমান্য ক'রে নেতারা সদলবলে সভাস্থলে অগ্রসর হ'লেন ও পথে পুলিসের দ্বারা প্রহৃত হ'লেন। শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন সেই দলের একজন অগ্রণী। পুলিস সেখানে বেপরোয়াভাবে লাঠি চালনা করে। পুলিসের প্রহার খেয়েও সকলে "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি করতে থাকে। অতঃপর এ সভা ভেঙে দেওয়াতে শ্রীঅরবিন্দ বিপিনচন্দ্রের সঙ্গে পূর্ববঙ্গের জেলায় জেলায় ঘুরে সভাসমিতিতে স্বদেশী বক্তৃতা দিতে থাকেন। নানাস্থানে ঘুরে বেড়িয়ে তিনি দেখলেন যে, এইভাবে বক্তৃতা দিয়ে জাতীয়তাবাদের সম্যক্ প্রচার করা সম্ভব নয়। ভালোভাবে প্রচার করতে হ'লে একটি নিজস্ব দলীয় সংবাদপত্র থাকা চাই, তারই ভিতর দিয়ে প্রত্যহ দেশবাসীকে এই নতুন আদর্শের কথা শোনানো এবং বোঝানো চাই, তাদের মনে স্বাধীনতার উদ্দীপনা জাগিয়ে রাখা চাই, এবং তারই ভিতর দিয়ে উৎসাহী যুবকদের দেশের কাজে আহ্বান করা চাই।

"যুগান্তর" পত্রিকা

জাতীয়তাবাদ প্রচারের প্রয়োজন থেকেই প্রথমে "যুগান্তর" পত্রিকার সৃষ্টি হ'ল। বারীন্দ্রের পরামর্শ অনুসারে এই পত্রিকার জন্য একটি অফিস খোলা হ'ল, সেখান থেকে পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হ'তে থাকল। শ্রীঅরবিন্দের নামগন্ধও তার মধ্যে ছিল না, বারীন্দ্রেরও নাম ছিল না, কেবল প্রকাশক হিসাবে অবিনাশ ভট্টাচার্যের নাম ছিল। তিনিই হলেন এ পত্রের প্রকাশক, তিনিই কর্মকর্তা, কোষাধ্যক্ষ, পরিচালক প্রভৃতি সবকিছু। এ কাগজ প্রথমে খুব অল্প সংখ্যাতেই ছাপা হ'ত, তাও প্রায় বিক্রীত হ'ত না। শ্রীঅরবিন্দ মাঝে মাঝে এতে প্রবন্ধ লিখতেন, বারীন্দ্রও লিখতেন। ক্রমে আরো তিনজন ভালো ভালো লেখক জুটে গেল, তার মধ্যে উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একজন। এঁদের ভাষাও ছিল অতিশয় তেজস্বী ও হৃদয়গ্রাহী। শ্রীঅরবিন্দের ভাব ও নির্দেশ নিয়েই প্রথমে তাঁরা লিখতে শুরু করেন, কিন্তু তার পরে তাঁদেরও কলম ছুটল। এতে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্রূপ ও কাটা কাটা মন্তব্য প্রকাশিত হ'তে থাকল, সেই সঙ্গে গেরিলা যুদ্ধ কেমনভাবে করতে হয় তারও বিবরণ প্রবন্ধচ্ছলে বেরোতে থাকল। দেশের যুবকদের কাছে জানানো হ'তে লাগল দেশমাতার আহ্বান—এস এস, কে কোথায় আছ নির্ভীক সন্তান, সুখের সম্ভোগ ও প্রাণের মায়া ছেড়ে এগিয়ে এস। তোমাদের মাকে আষ্টেপৃষ্ঠে শৃঙ্খল দিয়ে বেঁধেছে, সেই শৃঙ্খল মুক্ত ক'রে দেবার জন্য মা আজ তোমাদের সকাতরে ডাকছেন। তুচ্ছ সব কাজ আর খেলাধূলা ছেড়ে দাও, ছুটে এস তোমরা তরুণ যুবকের দল, এই মাতৃসাধন যজ্ঞে আত্মাহুতি দিয়ে কে

ধন্য হ'তে চাও সাহস ক'রে এগিয়ে এস, মা তোমাদের মুখ চেয়ে রয়েছেন। আহ্বান শুনে দেশের ভাবপ্রবণ যুবকদের হৃদয় পুলকে ও আনন্দে সাড়া দিয়ে উঠল। তারা সব কিছু ভুলে মরিয়া হয়ে "যুগান্তর" অফিসে দলে দলে হানা দিতে লাগল। দেখতে দেখতে এর কাটতি অনেক বেড়ে গেল, তখন এই কাগজের এতই চাহিদা যে, দশ-বিশ হাজার ছাপিয়েও কুলানো যায় না। এক পয়সার কাগজ লোকে এক টাকা দিয়ে কিনতে চায়, এমনও হয়েছে যে, একশো টাকার নোট দিয়ে একজন একখানি কাগজ নিয়ে গেছে। এতে প্রচুর অর্থাগম হ'তে লাগল। অথচ অর্থের দিকে কারো দৃক্‌পাত নেই, সে অর্থ পড়ে থাকে একটা ভাঙা বাক্সের মধ্যে।

হাজার হাজার উদ্যমী যুবক সাগ্রহে এসে যোগ দেওয়াতে এই "যুগান্তর" অফিস বিপ্লবী দলের কেন্দ্রস্বরূপ হয়ে উঠল। বারীন্দ্র তাদের প্রধান নেতা, তাঁর নির্দেশেই তারা চালিত হয়। আর দেশের অনেক গণ্যমান্য ও ধনী ব্যক্তি গোপনে এদের প্রচুর অর্থসাহায্য করতে লাগলেন, তার মধ্যে অনেক জজ ম্যাজিস্ট্রেট এবং উচ্চ রাজ-কর্মচারীও ছিলেন। কেউ জানত না কোথা থেকে এত টাকা আসছে। সকলেই আশ্চর্য হয়ে দেখলে যে, এই ধরনের মহৎ কাজে কখনো টাকার অভাব হয় না, কোথা থেকে আপনি এসে জুটে যায়।

ন্যাশন্যাল কলেজ

এদিকে জাতীয় ভাবে দেশের যুবকদের শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করতে স্বতন্ত্র একটি ন্যাশন্যাল কলেজ খোলার কথা উঠল। রাজা সুবোধ মল্লিক বললেন যে, তিনি এক লক্ষ টাকা এর জন্য দিতে রাজী

আছেন, যদি শ্রীঅরবিন্দ নিজে এই কলেজের ভার নেন এবং অল্প বেতনে প্রিন্সিপ্যালের পদ নিয়ে কাজ করতে স্বীকৃত হ'ন। তিনি তাতেই স্বীকৃত হয়ে শেষবারের মতো বরোদায় গিয়ে ৭৫০৲ টাকা বেতনের কাজটি ছেড়ে এসে মাত্র ১৫০৲ টাকা বেতনে এই কলেজের প্রিন্সিপ্যালের পদ গ্রহণ করলেন। পরে গৌরীপুরের রাজা প্রভৃতি আরো অনেকে বহু লক্ষ টাকা দান করেন। সেই কলেজই এখনকার সুবিখ্যাত যাদবপুর কলেজ ও ইউনিভারসিটি।

শ্রীঅরবিন্দ যখন বরোদা থেকে কলকাতায় ফিরলেন তখন এই কথা সর্বত্র জানাজানি হয়ে গেছে। ছাত্রেরা দলে দলে এই মহা-বিদ্বান দেশপ্রেমিককে দেখতে ছুটল। কিন্তু তাঁকে চাক্ষুষ দেখে সকলে অবাক হয়ে গেল। নিতান্ত সাদাসিধা একজন নিরীহ ভদ্রলোক, সামান্য একটা ধুতি পরনে ও টুইল শার্ট গায়ে, পায়ে ক্যাম্বিশের জুতো, তারও তলাটা ফুটো। নিতান্ত মৃদুভাষী ও মিষ্ট-ভাষী, মুখে একটু সলজ্জ হাসি। এই কি সেই মহাপণ্ডিত, যিনি ইউরোপের সাতটি ভাষা ও ভারতের সাতটি ভাষার সুদক্ষ ওস্তাদ? এই কি সেই আত্মত্যাগী ও স্বার্থত্যাগী স্বদেশসেবক যিনি মাতৃমন্ত্রের উদ্গাতা, যাঁর নাম আজ বিপ্লববাদী যুবকদের মুখে মুখে? এ তো শিশুর মতো একজন সরল মানুষ!

দেশ-বিদেশের ছাত্রেরা এসে এই কলেজে যোগ দিতে লাগল। সেখানে শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষা দেবার ব্যবস্থাই ছিল অন্য রকমের। ভারতীয় জ্ঞান ও জাতীয় আদর্শের দিকেই তার লক্ষ্য, অথচ আধুনিক জগতের কোনো আধুনিক শিক্ষাই তার থেকে বাদ নেই। তাঁর পড়াবার পদ্ধতিও সম্পূর্ণ নতুন ধরনের। সকল ক্লাসের ছেলেরা

এসে জড়ো হয়ে তাঁর মিষ্ট কণ্ঠের অপূর্ব পঠন শুনত, এমন কি অন্যান্য প্রোফেসররাও নিজেদের ক্লাস ছেড়ে শ্রীঅরবিন্দের লেকচার শুনতে ছুটে যেত।

"বন্দে মাতরম্" পত্রিকা

এর পরে "বন্দে মাতরম্" পত্রিকার আবির্ভাব হয়।. শ্রীঅরবিন্দ দেখলেন যে, বাংলা পত্রিকা ছাড়া আদর্শ প্রচারের জন্য একটি ইংরেজী পত্রিকাও থাকা দরকার। ইতিপূর্বে "নিউ ইণ্ডিয়া" নামে এক সাপ্তাহিক কাগজ প্রকাশিত হ'ত, বিপিনচন্দ্র পাল ছিলেন তার সম্পাদক। তিনি সেই পত্রিকাকে দৈনিকে রূপান্তরিত ক'রে শ্রীঅরবিন্দকে তাতে লেখবার ভার দিতে চাইলেন। শ্রীঅরবিন্দ তাতে রাজী হয়ে কাগজের পুরানো নামটি বদ্‌লে দিয়ে নতুন নাম রাখলেন "বন্দে মাতরম্", কিন্তু সম্পাদক হিসাবে নিজের নাম তাতে প্রকাশ করলেন না। তখন থেকে দৈনিক পত্র হিসাবে "বন্দে মাতরম্" প্রকাশিত হ'তে থাকে। অতঃপর দুই মাস পর থেকে সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলি শ্রীঅরবিন্দই লিখতে থাকেন। এর পূর্বে কোনো ইংরেজী কাগজেই ভারতের জাতীয়তাবাদের কথা ও পূর্ণ স্বাধীনতার দাবির কথা এমন স্পষ্ট ও নির্ভীকভাবে লেখা হ'ত না, কেউই তা লিখতে সাহস করত না। কিন্তু "বন্দে মাতরম্" সম্পূর্ণ নির্ভয়েই সেই কথা স্পষ্ট বলতে শুরু করল। ভারতের সকল দেশের লোক এই অসমসাহসিক কাগজখানি আগ্রহের সঙ্গে পড়তে থাকল, হিমাচল থেকে কুমারিকা পর্যন্ত কোথাও এ পত্রের প্রচার হ'তে বাকা রইল না। বঙ্কিমের "বন্দে মাতরম্" মন্ত্র এতদিনে সার্থক

হ'ল, ভারতের সকল অঞ্চলের মানুষদের হৃদয়ে এই মন্ত্রের গভীর অর্থপূর্ণ নির্ঘোষ ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হ'তে থাকল। অথচ কেউ জানলে না যে, এর অমৃত বাণীগুলি কার অমর লেখনী থেকে নিঃসৃত হচ্ছে। এর রচনার লালিত্যে ও ভাষার মাধুর্যে ও বক্তব্যের স্পষ্টতায় ও দুঃসাহসে সবাই অবাক হয়ে গেল। শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল এই "বন্দে মাতরম্" পত্রিকা সম্বন্ধে নিজেই বলেছিলেন যে, ভারতীয় সংবাদপত্রের ইতিহাসে এ এক নতুন যুগ, কারণ গোড়া থেকেই এ কাগজ সুনিপুণ ওস্তাদের হাতে লেখা হ'তে থাকল। সে এমন লেখা যে, বিলাতের কাগজে পর্যন্ত সেই নির্ভীক প্রবন্ধগুলি উদ্ধৃত ক'রে দেওয়া হ'ত। তখন থেকে শ্রীঅরবিন্দ কেবল ছাত্রদের নয়, সমগ্র ভারতের শিক্ষাদাতা হলেন।

রাজদ্রোহের মামলা

শাসনকর্তারা কিন্তু এতদিন চোখ বুজে বসে নেই। তারা সমস্তই লক্ষ্য করছে। বাংলা কাগজে যা বলে তাকে তাচ্ছিল্য করা চলে, কিন্তু ইংরেজী কাগজের এমন স্পর্ধা সহ্য করা যায় না। তারা মনে মনে জ্বলছিল, কিন্তু এ কাগজের প্রবন্ধগুলি এমন সুমার্জিত ও ন্যায়-সঙ্গতভাবে আইন বাঁচিয়ে এবং গুছিয়ে লেখা যে, মামলার প্যাঁচের মধ্যে তাকে ফেলাই যায় না। কিছুকাল ধরে অপেক্ষা করতে করতে তারা একবার একটা সুযোগ পেয়ে গেল। "যুগান্তর" পত্রিকাতে কোনো একটি রাজদ্রোহসূচক লেখা বেরিয়েছিল, "বন্দে মাতরম্" পত্রিকাতে সেটি অনুবাদ ক'রে ছাপানো হয়েছে। এই সূত্রে রাজ-দ্রোহের মামলা রুজু করা হ'ল "যুগান্তর" কাগজের প্রকাশক অবিনাশ

ভট্টাচার্যের নামে, আর "বন্দে মাতরম্" কাগজে তার অনুবাদ লিখেছেন বলে শ্রীঅরবিন্দের নামে। শ্রীঅরবিন্দ যখন শুনলেন যে, তাঁর নামে ওয়ারেণ্ট বেরিয়েছে, তখন তিনি নিজেই থানায় গিয়ে পুলিসের কাছে ধরা দিলেন। শুধু তাই নয়, পাছে এই রাজদ্রোহের মামলায় তাঁর কোনো শাস্তি হয় আর কলেজের নামে তাতে কিছু অপযশ হয়, তাই মামলা শুরু হবার আগেই তিনি অধ্যক্ষের পদ অন্য একজনকে নিতে ব'লে কলেজের সঙ্গে সকল সংস্রব ছেড়ে দিলেন। তিনি দেখলেন যে, কলেজ করা আর রাজনীতির লড়াই করা একসঙ্গে উচিত হয় না।

কিন্তু সে মামলা শেষ পর্যন্ত ধোপে টি'কল না। শ্রীঅরবিন্দ যে "বন্দে মাতরম্" পত্রিকার সম্পাদক এ কথা কিছুতে প্রমাণই করা গেল না। "যুগান্তরের" অবিনাশ ভট্টাচার্যও দণ্ড থেকে রেহাই পেলেন, কারণ স্বামী বিবেকানন্দের ভাই ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত আদালতে স্বীকার করলেন যে, প্রবন্ধটি তাঁরই লেখা। তা ছাড়া, বিচারপতি এই রায় দিলেন "বন্দে মাতরম্" কাগজের প্রবন্ধগুলি যেই লিখুক, সেগুলিকে ঠিক রাজদ্রোহসূচক বলা চলে না।

কিন্তু কে যে সেই প্রবন্ধগুলির গুপ্তনামা লেখক, এবার দেশের সকল লোকেই সে কথা জানতে পারলে। শ্রীঅরবিন্দকে কারোই তখন আর জানতে বাকী রইল না।

"অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার"

রাজদ্রোহের সেই অভিযোগে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে শ্রীঅরবিন্দ একদিনেই প্রখ্যাত হয়ে উঠলেন। তখন সারা ভারতময় একটা সাড়া

পড়ে গেল, সবাই জানলে যে, নিজের প্রাণকে তুচ্ছ ক'রে দেশে স্বাধীনতা আনবার মহা দুঃসাহসিক কাজে তিনিই নেমেছেন। তিনি নাম চান না, খ্যাতি চান না, অর্থ চান না, স্বার্থ চান না, শুধুই চান দেশকে স্বাধীন করতে, তার জন্য সব রকম কষ্ট লাঞ্ছনাই তিনি সইতে রাজী আছেন। চারিদিকে তাঁর নামে ধন্য ধন্য পড়ে গেল। রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত তাঁর এক অমর কাব্যের দ্বারা এঁকে অভিনন্দিত করলেন। যদিও শ্রীঅরবিন্দ তাঁর চেয়ে বয়সে অনেক ছোটো, তবুও তিনি লিখলেন—

"অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।
হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ-আত্মার
বাণী মূর্তি তুমি। তোমা লাগি নহে মান,
নহে ধন, নহে সুখ ; কোনো ক্ষুদ্র দান
চাহ নাই কোনো ক্ষুদ্র কৃপা , ভিক্ষা লাগি
বাড়াওনি আতুর অঞ্জলি।..."
ইত্যাদি

"ইণ্ডিয়ান পেট্রিয়ট" নামক পত্রিকাতে লিখলে যে, দেশের লক্ষ লক্ষ নরনারী তাঁকে প্রণাম জানাচ্ছে। তারা আজ বলছে যে, তিনি মানুষ নন, দেবতা, তাদেরই জন্য তিনি নিজের কষ্টকে কষ্ট বলে মানেন না। দেশের জন্য তিনি আপন জীবনকে উৎসর্গ করেছেন, তাঁর এই নির্ভীক মহত্ত্ব সমগ্র জাতিটাকে নব-প্রেরণাতে উজ্জীবিত করবে।

মডারেটদের সঙ্গে সংঘর্ষ

শ্রীঅরবিন্দ কিন্তু তার পরে দেখলেন যে, কেবল আমলাতন্ত্রের শাসনকর্তারাই আমাদের দেশের শত্রু নয়, এখানকার মডারেটদের

দলও আর এক রকমের শত্রু। তারাই এবার এই জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা করতে লাগল। "স্বরাজ" লাভের প্রস্তাবকে তারা কিছুতেই নিতে চায় না। আর কংগ্রেসের মধ্যে তারাই তখনও দলে ভারী, তাদের কথাই খাটে। ১৯০৬ সালের কলকাতা কংগ্রেসে সভাপতি দাদাভাই নৌরোজী "স্বরাজ" কথাটার মানে করলেন, ব্রিটিশের অধীনে থেকে স্বায়ত্তশাসন। শ্রীঅরবিন্দ বললেন তা নয়, ওর মানে পূর্ণ স্বাধীনতা। ভারতকে একদিন জগদ্‌গুরু হতে হবে, সমস্ত জগৎকে মুক্তি দেবার জন্য তার নিজের আগে মুক্তি চাই। ১৯০৭ সালের সুরাট কংগ্রেসে এই প্রস্তাবকে গৃহীত করবার জন্য আগের থেকেই অনেক চেষ্টা হতে লাগল। তাতে নরমপন্থী ও গরমপন্থী দুই দল একেবারে আলাদা হয়ে গেল। এরা বললে আমাদের লোক সভাপতি হবে, ওরা বললে তা নয়, আমাদের লোক হবে। এই নিয়ে দুই দলে মারামারি ও জুতা ছোঁড়াছুড়ি পর্যন্ত হয়ে কংগ্রেসের সভা ভেঙেই গেল। এই কংগ্রেসেও শ্রীঅরবিন্দ প্রকাশ্যভাবে যোগ দেননি, কিন্তু স্বরাজপন্থীদের দল প্রত্যেক বিষয়ে তাঁরই নির্দেশমত চলছিল। সেই দারুণ গণ্ডগোল ও মারামারির সময় তিনি ছিলেন নিরুদ্বিগ্ন, প্রশান্ত। কংগ্রেসের বৈঠক ভেঙে যাওয়াতে যদিও তাঁরই মর্যাদা বাড়ল এবং মডারেটদের মর্যাদা নষ্ট হ'ল, আর যদিও প্রত্যেক প্রদেশ থেকে তাঁর জন্য ব্যগ্র আহ্বান আসতে থাকল, তবুও তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধ হ'ল না দেখে তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হলেন। মনে মনে বুঝলেন, তাঁর সাধনা এখনও সার্থক হয়নি।

বিষ্ণুভাস্কর লেলে

শ্রীঅরবিন্দের মনে তখন এই ঝোঁক এসে গেছে যে, আরো বেশি সাধনা চাই। তাঁর যা ব্রত তার পক্ষে সাধারণ ধরনের শক্তি যথেষ্ট নয়, তার চেয়ে বেশি দৈবী-শক্তি দরকার। তেমন শক্তি পেতে হ'লে আরো গভীরভাবে ও সার্থকভাবে যোগসাধনার দরকার। এত কাজের মধ্যেও যোগ করার কাজটি তিনি কখনই ভোলেননি। ১৯০৪ সাল থেকে তিনি বরাবর যোগ ক'রে আসছেন। প্রথম প্রথম নিভৃতে ব'সে তিনি ধ্যান করতেন, তার জন্য নির্দিষ্ট একটা সময় থাকত। তার পর নানারূপ কাজের চাপে সে সুযোগ না থাকাতে তিনি কাজ করতে করতেই সব কিছু ফেলে রেখে হঠাৎ উঠে চলে যেতেন, ঘরের নিরালায় ব'সে কিছুক্ষণ কাটিয়ে আসতেন। তা ছাড়া, সকল রকমের কাজ করতে করতেও তাঁর মন যোগের মধ্যে চলে যেত। এইভাবে তাঁর যথাসাধ্য তিনি এই চার বছর ধরে ক'রে আসছেন, কিন্তু তাতে তো বিশেষ কোনো ফল হ'তে দেখা গেল না। এবার কোনো অভিজ্ঞ যোগীর কাছে সাহায্য নেওয়া দরকার, জানা দরকার যে, এই পথে আরো কতটা কি করা যেতে পারে। তাই তিনি ১৯০৭ সালের কংগ্রেস অধিবেশনের পরেই যখন একবার বরোদায় গেলেন, তখন সেখান থেকে পুণার যোগী বিষ্ণুভাস্কর লেলেকে ডেকে পাঠালেন।

লেলের সঙ্গে আগের থেকেই তাঁর কিছু হৃদ্যতা ছিল। ইতি-পূর্বে এঁর কাছেই তিনি যোগ সম্বন্ধে কিছু কিছু সন্ধান ও নির্দেশ পেয়েছিলেন। এবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হতেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে, যোগের সাধনাকে সার্থক করতে হ'লে আর কি করা

যেতে পারে। লেলে বললেন যে, সমস্ত রাজনৈতিক তৎপরতা ছেড়ে দিয়ে যদি একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে নিরালায় তাঁর সঙ্গে কিছুকাল যোগে বসতে পারতেন, তাহ'লে তিনি দেখিয়ে দিতে পারতেন। তাতেই রাজী হয়ে শ্রীঅরবিন্দ বরোদায় একজনের বাড়িতে সম্পূর্ণ নিভৃত একটি ঘরে কিছু দিনের জন্য আশ্রয় নিলেন, লেলেকে রাখলেন সঙ্গে। লেলে বললেন যে, আগে মনটিকে একদম খালি ক'রে ফেলতে হবে, মন যেন একেবারে ফাঁকা হয়ে যায়; কোনো কিছু চিন্তাই তার মধ্যে আর ঢুকতে না পারে। লেলে বললেন যে, আমাদের চিন্তাগুলো তো মনের মধ্যেই জন্মায় না, সেগুলো বাইরের থেকে এসে মনের মধ্যে ঢোকে, আমরা ইচ্ছা করলে তাদের না ঢুকতেও দিতে পারি। এমনভাবে মনকে শূন্য ক'রে রাখতে পারলেই তখন প্রকৃত যোগের সম্ভাবনা আসবে। মনকে আগে সম্পূর্ণ ফাঁকা অবস্থাতে আনতে হবে।

মনকে একদম ফাঁকা রেখে দেওয়া কখনো সম্ভব নাকি? শ্রীঅরবিন্দ এমন কথা কখনো শোনেননি। তবু তিনি ভাবলেন, আচ্ছা বেশতো দেখাই যাক না, ও যেমন যেমন বলছে তেমনি চেষ্টা ক'রে দেখিই না কি হয়। মন নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে তিনি দেখলেন যে, সত্যই তাই, চিন্তাগুলো বাইরের থেকে এসেই মনের মধ্যে ঢোকে, ইচ্ছা করলে সেগুলো আসবার উপক্রম হওয়ামাত্র তাদের তাড়িয়ে দেওয়া যায়, আর মনকে ফাঁকা অবস্থাতেও রাখা যায়। মাত্র তিনটি দিন স্থির হয়ে ব'সে ঐকান্তিকভাবে এই চেষ্টা করতে করতেই তাঁর মন একেবারে নিশ্চল নিস্তরঙ্গ নিথর হয়ে গেল। তখন সেখানে এসে পড়ল নীরব ব্রহ্মের এক আশ্চর্য অনুভূতি। ব্রহ্ম

কথাটির মানে আর কিছুই নয়, সে একটা অনাবিল অন্তহীন চেতনা, যা বৃহৎ থেকে বৃহত্তম হয়ে বেড়েই চলে, নির্মল নিঃসীম আকাশের চেহারার সঙ্গে যার খানিকটা তুলনা করা যায়। শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে তিনি আরো পেয়ে গেলেন বুদ্ধদেবের বর্ণিত নির্বাণ অবস্থার মতো একটা অনুভূতি, যেন সমস্তই শূন্য, সমস্তই ছায়া। নিচে রাস্তা দিয়ে লোক চলছে, তিনি উপরের বারান্দা থেকে চেয়ে দেখছেন যেন সব বায়স্কোপের ছায়াবাজি, আগে যেমন সব কিছুকে বাস্তব ব'লে বোধ হ'ত তেমন আর এখন বোধ হচ্ছে না।

এটা যে ব্রহ্মানুভূতির ব্যাপার, তা অবশ্য শ্রীঅরবিন্দ তখন জানবেন কেমন ক'রে? যা যা তিনি অনুভব করছেন তাই শুধু শুনিয়ে দিলেন লেলেকে। লেলে কিন্তু তাঁর কথা শুনেই অবাক। এ তো খাঁটি ব্রহ্মানুভূতি! লেলে একজন পাকা যোগী, বহুকাল থেকে যোগ করছেন, কিন্তু এতদিনেও তিনি নিজে এই অনুভূতি পাননি, শ্রীঅরবিন্দ যে পাবেন তাও তিনি কল্পনা করেননি। অথচ তিনি আপনা থেকেই এটা তিনদিনের মধ্যে পেয়ে গেলেন! চমৎকৃত হয়ে লেলে তখন বললেন, তোমাকে আর আমার কাছ থেকে কিংবা কারো কাছ থেকেই কোনো উপদেশ নিতে হবে না, তোমার নিজের মধ্যেই রয়েছেন তোমার যিনি পরমগুরু, তিনি ভিতর থেকে যেমন নির্দেশ দেবেন তেমনি ভাবেই চলবে, তাতেই তোমার কাজ হবে।

বোম্বাই বক্তৃতা

বরোদা থেকে তিনি গেলেন বোম্বাই আর পুণা, লেলে বরাবর রইলেন সঙ্গে।* যেখানেই তিনি যাচ্ছেন, লোকে তাঁকে বিপুল

সম্বর্ধনা করছে, বড়ো বড়ো সভাতে তাঁকে বক্তৃতা দিতে বলছে, কিন্তু তিনি বলবার মতো কোনো কথাই খুঁজে পাচ্ছেন না। মন হয়ে গেছে আকাশের মতো ফাঁকা, কিছুই আর সেখানে ঢুকছে না। লেলেকে তিনি জানালেন তাঁর এই মুশ্‌কিলের কথা। লেলে বললেন, তোমাকে মন থেকে কোনো কথাই বলতে হবে না। আগের থেকে কোনো কিছু না ভেবে তুমি সভাতে গিয়ে দাঁড়াবে, উপস্থিত সকলকে নমস্কার করবে, তারপর চোখ বুজে একটু অপেক্ষা করবে। তার পরে যা বলবার তা ভিতরকার গুরুই তোমার মুখ দিয়ে বলাবেন।

এমন কথাও শ্রীঅরবিন্দ কখনো শোনেননি। তিনি ভাবলেন এটাও পরীক্ষা ক'রে দেখা যাক। বোম্বাই শহরে প্রকাণ্ড সভাতে তিনি ঐভাবেই গিয়ে দাঁড়ালেন। একটু থেমে থেমে তাঁর মুখ দিয়ে যে বাণী নির্গত হ'তে থাকল, সভাসুদ্ধ লোক মুগ্ধ হয়ে তাই শুনলে। এমন এক বিপ্লবের কথার সঙ্গে ভগবানের কথা মেশানো অদ্ভুত বক্তৃতা তারা কখনো কানে শোনেনি। সেই বিখ্যাত বক্তৃতাতে তিনি বললেন,—"জাতীয়তাবাদ তো একটা রাজনৈতিক চাল মাত্র নয়, জাতীয়তা হ'ল একটা ধর্ম, মানুষকে এটা ভগবানের দান। কিন্তু মানুষের মধ্যে ধর্ম জেগে উঠলেই তখন অধর্ম তাকে দাবিয়ে রাখতে প্রাণপণে চেষ্টা করে, যদিও শেষ পর্যন্ত তা পারে না। এখানেও তাই হচ্ছে, তাই হবে। কিন্তু কোনো অস্ত্রই তোমাদের এ ধর্মকে বিনাশ করতে পারবে না। তোমাদের এ জাতীয়তা অমর, এ স্বয়ং ভগবানের প্রকাশ। ভগবানকে কখনো হত্যা করা যায় না, ভগবানকে কখনো জেলে আটক করা যায় না।"

শুধু বক্তৃতার বেলাতেই নয়, তিনি অতঃপর লেখার বেলাতেও দেখলেন যে, ঠিক এই রকমই হচ্ছে। প্রবন্ধাদি লিখতে ব'সে তাঁকে আর কিছু ভাবতে হচ্ছে না, কলম দিয়ে আপনিই লেখা বেরিয়ে আসে। সে লেখা একেবারে নির্ভুল হয়, তার মধ্যে আর কোনো কাটাকুটি বা সংশোধনের দরকার হয় না। তাই তিনি তারপর থেকে একটা কিছু লিখে দ্বিতীয়বার আর পড়ে দেখতেন না, যা লেখা বেরিয়ে গেছে তাই ছাপতে দিয়ে দিতেন। এমনও হয়েছে যে, তিনি অন্য দিকে চেয়ে আছেন তবুও ঠিক লেখা হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ ঘুম থেকে তুলে লিখতে বললেও তৎক্ষণাৎ তিনি চমৎকার ভাবে লিখে দিচ্ছেন। লালা লজপত রায়কে যখন নির্বাসিত করা হয় তখন মধ্যরাত্রে তাঁকে ঘুম থেকে তুলে সেই কথা শোনানো হয়। তিনি তখনই তাই নিয়ে এমন এক তীব্র সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখে দিলেন যা সেই ভোরেই ছাপা হয়ে বেরিয়ে গেল, তাই পড়ে ব্রিটিশ কর্তাদের মনে দারুণ জ্বালা ধরে গেল। অথচ এমন কৌশলে তা লেখা যে, লেখককে তার জন্য জেলে দেওয়া যায় না।

এইভাবে তখন তিনি একসঙ্গে ডুটো কাগজ চালাবার কাজও করতে লাগলেন, দেশনেতৃত্ব ক'রে সর্বত্র বক্তৃতাও দিতে লাগলেন, আবার এদিকে নিজেরই অন্তর্নির্দেশে যোগ সাধনাও ক'রে যেতে থাকলেন। এই সময়টাতে কিছুদিন তিনি গঙ্গার ধারে পানিহাটির দত্তদের বাগান বাড়িতে গিয়ে নির্জনবাস করেছিলেন। সে সময়ে লেলেও ছিলেন তাঁর সঙ্গে।

ভগবানের যন্ত্রস্বরূপ

এইখানে একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে, একদিকে তিনি রাজনৈতিক নেতা হয়ে দেশের স্বাধীনতা আনতে চাইছেন, বন্দুক ও বোমা আমদানি ক'রে গেরিলা যুদ্ধের আয়োজন করছেন, আর একদিকে তিনি ভগবানের চেতনার সঙ্গে নিজের চেতনাকে মেলাবার জন্য যোগ করছেন, এটা কেমন ক'রে সম্ভব হয়? কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের পক্ষে তা সম্ভব হয়েছিল এইজন্য যে, উদ্দেশ্যটা তাঁর একই, কর্মগুলিও তাঁর যে কারণে, যোগও তাঁর সেই কারণে,—তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল দেশমাতার মুক্তি। তাই এখানে কর্ম আর যোগে মিলে তাঁর কাছে এক হয়ে গেছে, এটা-ওটার সহায়তা করছে। গীতায় একে বলে কর্মযোগ। কারণ কর্ম সেখানে যোগের সহায়ক। সেই কর্মগুলির কোনোটাই নিজের জন্য নয়, সবই ভগবানের জন্য, ভগবানের যা অভিপ্রায় তাই সিদ্ধ করবার জন্য। অর্থাৎ এখানে তিনি নিজে কিছু করছেন না, ভগবান তাঁকে দিয়ে যা করাচ্ছেন তাই তিনি ক'রে যাচ্ছেন। নিজে তিনি কিছুই নন, কেবল ভগবানের যন্ত্রস্বরূপ হয়ে আছেন। ভগবান সেই যন্ত্রের উপর 'আরূঢ়' হয়ে তাকে যেদিকে চালাবেন সেই দিকেই সে চলবে, শ্রীঅরবিন্দ ঠিক এই ভাবটি নিয়েই সব কিছু ক'রে যাচ্ছেন। তাই তাঁর মনে কোনো উদ্বেগও নেই, কোনো ভয়ভাবনাও নেই, কোনো অহংকারও নেই। সহস্র দিকে সহস্র রকম কাজ তিনি যথোচিত ভাবেই ক'রে চলেছেন, কিন্তু নিজে তিনি স্থির, অবিচল। দেশের চারদিকে আন্দোলনের তাণ্ডবনৃত্য শুরু হয়েছে, তার মধ্যে কোথাও তিনি অর্থ ও শক্তি যোগাচ্ছেন, কোথাও বুদ্ধি যোগাচ্ছেন, কোথাও বিদ্যার প্রতিভা যোগাচ্ছেন,

কিন্তু নিজে ভিতরে ভিতরে তিনি স্থির, তিনি প্রশান্ত। শিবের তাণ্ডবনৃত্যের বর্ণনাতে আমরা এই রকমই শুনি, সহস্র দিকে সহস্র অঙ্গ বিস্তার ক'রে তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের তাণ্ডবনৃত্য করেন, কিন্তু কেন্দ্রস্থ দেহটি তাঁর একটুও নড়ে না। বিশ্বজোড়া তাণ্ডবনৃত্যের মধ্যে নিজে তিনি স্থির অবিচল।

এই ভগবানের যন্ত্রস্বরূপ হয়ে থাকার ভাবটা তিনি যে প্রকৃতই নিজের মনে-প্রাণে অনুভব করেছিলেন, ঐ সময়ে তাঁর স্ত্রীকে লেখা একটি চিঠি থেকেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়। আমরা সেই চিঠি থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি ঃ

"...8th January আসিবার কথা ছিল, আসিতে পারি নাই, সে আমার ইচ্ছায় ঘটে নাই। যেখানে ভগবান নিয়া গিয়াছেন সেইখানে যাইতে হইল। এইবার আমি নিজের কাজে যাই নাই, তাঁহারই কাজে ছিলাম। আমার এইবার মনের অবস্থা অন্যরূপ হইয়াছে, সে কথা এই পত্রে প্রকাশ করিব না। তুমি এখানে এস, তখন যাহা বলিবার আছে বলিব, কেবল এই কথাই এখন বলিতে হইল যে, এর পরে আমি আর নিজের ইচ্ছাধীন নই, যেইখানে ভগবান আমাকে নিয়া যাইবেন সেইখানে পুতুলের মতো যাইতে হইবে, যাহা করাইবেন তাহা পুতুলের মতো করিতে হইবে। এখন এই কথার অর্থ বোঝা তোমার পক্ষে কঠিন হইবে, তবে বলা আবশ্যক নচেৎ আমার গতিবিধি তোমার আক্ষেপ ও দুঃখের কথা হইতে পারে। তুমি মনে করিবে আমি তোমাকে উপেক্ষা করিয়া কাজ করিতেছি, তাহা মনে করিবে না। এই পর্যন্ত আমি তোমার বিরুদ্ধে অনেক দোষ করিয়াছি, তুমি যে তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়াছিলে সে স্বাভাবিক, কিন্তু এখন আমার আর স্বাধীনতা নাই, এর পরে তোমাকে বুঝিতে হইবে যে, আমার সব কাজ আমার উপর নির্ভর

না করিয়া ভগবানের আদেশেই হইল। তুমি আসিবে, তখন আমার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিবে। আশা করি ভগবান আমাকে তাঁহার অপার করুণায় যে আলোক দেখাইয়াছেন, তোমাকেও দেখাইবেন, কিন্তু সে তাঁহারই ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তুমি যদি আমার সহধর্মিণী হইতে চাও তাহা হইলে প্রাণপণে চেষ্টা করিবে যাহাতে তোমার একান্ত ইচ্ছার বলে তোমাকেও করুণার পথ দেখাইবেন। এই পত্র কাহাকেও দেখিতে দিবে না, কারণ যে কথা বলিয়াছি সে অতিশয় গোপনীয়। তোমা ছাড়া আর কাহাকেও বলি নাই, বলা নিষিদ্ধ। আজ এই পর্যন্ত।"

শ্রীঅরবিন্দের তখনকার কর্মপদ্ধতি বুঝতে হ'লে এই কথাগুলি সমুচিতভাবে হৃদয়ঙ্গম করা দরকার। ঐ মনোভাব নিয়ে তখন তাঁর যোগও যেমন বাড়ল, কাজও তেমনি বাড়ল। কর্মের ক্ষেত্র তাঁর উত্তরোত্তর বেড়েই যেতে থাকল। দিবারাত্র পরিশ্রম ক'রে এবং সময়মত না-খেয়ে না-ঘুমিয়ে তাঁর শরীর কিন্তু ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল। ভিতর থেকে যেন একটা ইঙ্গিতও পাচ্ছিলেন যে, আর নয়, এইবার তুমি থেমে যাও, কিছুকাল বিশ্রাম নাও। কিন্তু কাজে নেমে তিনি থেমে যাবার মানুষ নন। অসুস্থ শরীর নিয়েও তিনি কাজের মাত্রা কিছু কম করতেন না। আরো কত কাল ঠিক এইভাবে চলত সে কথা বলা যায় না, কিন্তু এবার অন্য এক নতুন পালা শুরু হবার সময় এল, তাই কেউ যেন জোর ক'রে তাঁর জীবনের মোড় ফিরিয়ে দিলে। অকস্মাৎ একদিন রঙ্গমঞ্চের পট-পরিবর্তন হয়ে গেল। ভারতে এসে প্রথমে তিনি হলেন প্রফেসর, তার পরে হলেন স্বদেশী নেতা, তার পরে সম্পাদক। এবার হবেন জেলখানার কয়েদী।

মাণিকতলায় বোমা আবিষ্কার

বোমার মামলার কথাটা একটু গোড়া থেকে বলা দরকার। কলকাতায় খালপারে মাণিকতলা অঞ্চলের মুরারিপুকুর রোডে একটি বিস্তীর্ণ বাগানবাড়ি ছিল, সেটি শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর ভাইদের পৈতৃক সম্পত্তি। সাত বিঘা জমি নিয়ে আম-কাঁঠালের গাছ ও বাঁশঝাড়ে পরিপূর্ণ এই বাগানটিতে ছিল দুটি পুকুর ও একটি একতলা বাড়ি। সেই বাড়িতে চওড়া বারান্দা ছাড়া তিনখানি ঘর। বারীন্দ্র ও তাঁর দলের নেতাস্থানীয় সর্বত্যাগী কয়েকজন যুবক ইদানিং এই বাড়িতেই থাকতেন। এঁরা আগে যুগান্তর অফিসে একত্রে মিলিত হতেন, কিন্তু পুলিসের গুপ্তচরদের সেখানে প্রায়ই যাতায়াত হচ্ছে জেনে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর ভাই বারীন্দ্রকে বলেন তাঁর দলবল নিয়ে ঐ বাগানে গিয়ে থাকতে, কারণ একটু সাবধানে থাকলে ওখানে পুলিসের নজর পড়বে না। বারীন্দ্র সেখানে সরে গিয়ে যুবকদের নিয়ে ভবানী মন্দিরের মতোই একটি গুপ্ত সমিতি গড়ে তুললেন। বাহ্যতঃ সেখানে গীতা পড়ানো হ'ত, যোগ সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হ'ত, এদিকে তলে তলে সেখানে বন্দুক ও পিস্তল প্রভৃতি সংগ্রহ করা হ'ত, আর বোমা প্রস্তুত করা হ'ত। বারীন্দ্র, উপেন্দ্র, উল্লাসকর, প্রভৃতি বাছা বাছা বিপ্লবীরা সেখানে বাস করতেন, অন্যান্য যুবকেরা বাইরের থেকে যাতায়াত করতেন। কোনো একদিন প্রকাশ্যভাবে এঁরা বিপ্লবের কাজ শুরু করবেন, এইজন্যই আগের থেকে এঁদের যা কিছু আয়োজন। কিন্তু অতঃপর বারীন্দ্র ও তাঁর দলীয় যুবকেরা স্থির করলেন যে, সে এখন পরের কথা, আপাতত রাজপুরুষদের উৎপীড়ন বন্ধ করতে সন্ত্রাসবাদের সৃষ্টি করতে হবে, যারা বেশি অত্যাচারী

তাদের গুপ্তভাবে হত্যা করতে হবে, যেমন রাশিয়া প্রভৃতি দেশের সন্ত্রাসবাদীরা করত। শ্রীঅরবিন্দকে এঁরা অবশ্য এই অভিসন্ধির কথা কখনো কখনো জানাতেন, কিন্তু তিনি এর সমর্থন করতেন ব'লে মনে হয় না। "তোমরা যা ভালো বোঝ করো" এই পর্যন্ত ব'লেই তিনি চুপ ক'রে থাকতেন। বোমা, বন্দুক প্রভৃতি সংগ্রহ করতে তিনি বলেছিলেন প্রকাশ্য লড়াইএর জন্য, গুপ্তঘাতকতা করবার জন্য নয়।

কিংসফোর্ড নামে একজন অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, তিনি বাংলাদেশে অনেক অত্যাচার ও অন্যায় বিচার ক'রে মজঃফরপুরে বদলি হয়ে যান। ১৯০৮ সালে বারীন্দ্রের দল সিদ্ধান্ত করেন যে, মজঃফরপুরে গিয়ে তাকে বোমার দ্বারা হত্যা করতে হবে। ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকীর উপর এই কাজের ভার পড়ে। তারা কিংস-ফোর্ডের গাড়ি ব'লে ভুল ক'রে অন্য এক গাড়ির উপর বোমা নিক্ষেপ করে, তাতে দুটি নিরীহ ইউরোপীয় মহিলা নিহত হয়। কিন্তু ওরা দুজনে পালাবার পথে বিভিন্ন স্থানে ধরা পড়ে। তার মধ্যে প্রফুল্ল চাকী তখনই পিস্তলের গুলিতে আত্মহত্যা করে, আর বিচারে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়।

তখন থেকে ব্যাপকভাবে ধরপাকড় শুরু হয়। মাণিকতলার বাগানের উপর পুলিসের নজর আছে, এ কথা শ্রীঅরবিন্দ সন্দেহ করেছিলেন। তাই তিনি ব'লে পাঠিয়েছিলেন যে, অস্ত্রাদি সরিয়ে ফেলে সবাই যেন সেখান থেকে সরে যায়। কয়েকজনকে সরিয়ে দেওয়াও হয়েছিল, কিন্তু সকলকে নয়, আর অস্ত্রাদিও সরানো হয়নি। হত্যার একদিন পরেই পুলিস হঠাৎ ভোররাত্রে সেখানে হানা দেয়,

ও সেখানকার সব কিছু আবিষ্কার ক'রে সকলকে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে যায়।

শ্রীঅরবিন্দের গ্রেপ্তার

ঠিক ঐ দিনে ঐ সময়ে গ্রে স্ট্রীটে "নবশক্তি" কাগজের অফিসের উপরতলায় হানা দিয়ে শ্রীঅরবিন্দকেও গ্রেপ্তার করা হয়। ঐ কাগজটিরও পরিচালনার ভার নিয়ে সম্প্রতি তিনি ঐ বাড়িতে উঠে গিয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী মৃণালিনী আর ভগ্না সরোজিনীও সেখানে তখন থাকতেন, অবিনাশ ভট্টাচার্যও বরাবরই তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন। শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর স্ত্রী সেখানে একটি ঘরে মেঝেতে শতরঞ্চি পেতে শুয়েছিলেন। গ্রেপ্তারী পরওয়ানা নিয়ে ইংরেজ পুলিস কর্মচারী ভোর রাত্রে সেখানেই গিয়ে হাজির হয়, শ্রীঅরবিন্দকে মাটিতে শুয়ে থাকতে দেখে সে বিদ্রূপ ক'রে বলে, "শুনেছি তুমি একজন বিদ্বান গ্রাজুয়েট, এইভাবে মাটির উপর শুয়ে থাকতে তোমার লজ্জা করে না?" তাঁকে তখন কোমরে দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়। পরে শ্রীভূপেন্দ্র বসু প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তি সেখানে গিয়ে কোমরের দড়ি খুলিয়ে দেন। বিপ্লবী ব'লে অবিনাশ ভট্টাচার্যকেও ঐ সময় গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু খানাতল্লাসিতে সেখানে কতকগুলি কাগজপত্র ছাড়া আর কিছুই মেলে না। এক-স্থানে কেবল কাগজে মোড়া খানিকটা মাটি সযত্নে রক্ষিত ছিল। পুলিস ভাবলে এই একটা মারাত্মক রকমের নজির পাওয়া গেছে, নিশ্চয় এটা বোমা তৈরি করবার কোনো বিশেষ উপাদান। পরে কিন্তু জানা গেল তা দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি থেকে কুড়িয়ে আনা

খানিকটা মাটি। শ্রীরামকৃষ্ণের পায়ের ধুলো মেশানো পবিত্র মাটি ব'লে সেটুকু যত্ন ক'রে তুলে রাখা হয়েছিল।

আলিপুর ষড়যন্ত্রের মামলা

তার পরে মহা আড়ম্বরের সঙ্গে এঁদের সকলের বিরুদ্ধে মামলা শুরু হ'ল। গ্রেপ্তার হয়েছিলেন মোট ৩৬ জন ব্যক্তি, এঁরা সকলে অভিযুক্ত হলেন রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ও আইনের দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ রাজ্যকে উচ্ছেদ ক'রে দেবার ষড়যন্ত্রের অপরাধে। এ মামলার ২০০ জন সাক্ষী, ৪০০০ দলিল পত্র, ৫০০০ প্রামাণ্য বস্তু, তার মধ্যে বন্দুক, পিস্তল, গুলিগোলা, বোমা প্রভৃতি সব কিছুই আছে। দীর্ঘ এক বছর ধরে এই মামলা চলতে থাকল। ঐ এক বছরের মধ্যে অনেক কাণ্ডই হয়ে গেল। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা জেলখানার মধ্যে নরেন গোস্বামীর হত্যা। ইনি বিপ্লবী দলেরই একজন, জেলে যাবার পরে ইনি রাজসাক্ষী হয়ে দলের গুপ্ত খবরগুলি পুলিসকে ব'লে দিতে থাকেন। তখন জেলের মধ্যেই অত্যন্ত গোপনে পিস্তল আনিয়ে কানাইলাল দত্ত ও মেদিনীপুরের সত্যেন্দ্র বসু তাঁকে হত্যা করেন। এর পর থেকে কয়েদীদের প্রত্যেককে জেলের নির্জন কুঠরিতে ভরে রাখা হয়। হত্যার অপরাধে কানাইলাল ও সত্যেন্দ্র বসুর ফাঁসি হয়।

বোমার মামলার বিচার করলেন আলিপুরের সেশন জজ বীচক্রফ্ট। এখানে একটা আশ্চর্যের কথা এই যে, এই বীচক্রফ্ট ছিলেন কেম্ব্রিজের কলেজে শ্রীঅরবিন্দের সহপাঠী, সেখানকার পরীক্ষাতে শ্রীঅরবিন্দ যখন প্রথম স্থান অধিকার করেন তখন

বীচক্রফ্‌ট স্থান পান তাঁর নিচে। বীচক্রফ্‌ট তাঁকে দেখে অবশ্য চিনতে পেরেছিলেন আর সম্মান ক'রে তাঁকে স্বতন্ত্র আসন দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ তাতে অস্বীকৃত হয়ে আসামীদের জন্য নির্দিষ্ট খাঁচার মধ্যেই বসতেন। অনেক উকিল, ব্যারিস্টার এই মামলাতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আসামীদের পক্ষ নিয়ে লড়েছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের পক্ষে ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ।

এক বছর পরে এই মামলার সুদীর্ঘ রায় বেরোল। তাতে বলা হ'ল যে, ষড়যন্ত্রের সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ সম্পূর্ণ নির্দোষ, তিনি যে ওর মধ্যে সক্রিয়ভাবে লিপ্ত ছিলেন তার কোনোই প্রমাণ নেই। তিনি দেশের স্বাধীনতালাভ সম্বন্ধে বলতেন ও লিখতেন বটে, কিন্তু তিনি যে বাস্তবিক রাজদ্রোহসূচক কোনো কাজ করেছেন সে প্রমাণ পুলিস দেখাতে পারেনি। অন্যান্য আসামীদের দ্বীপান্তরবাসের দণ্ড দেওয়া হ'ল, কিন্তু বারীন্দ্র ও উল্লাসকরের ফাঁসির হুকুম হ'ল। পরে আপীলে সে হুকুমও রদ হয়ে গেল।

শাপে বর

বোমার মামলার আসামীরূপে পুরো একটি বছরের জন্য শ্রীঅরবিন্দকে জেলে থাকতে হয়েছিল। কিন্তু তিনি বলেন তাতে কোনো ক্ষতি হয়নি, বরং সেটা খুব ভালোই হয়েছিল। শ্রীঅরবিন্দের পক্ষেও ভালো, আমাদের পক্ষেও ভালো, আর সমগ্র জগতের পক্ষেও ভালো। শ্রীঅরবিন্দ নিজেও পরে তাই বলেছিলেন যে, ইংরেজ গভর্নমেণ্ট আমার শত্রু নয়, বরং তারা আমার পরম মিত্র। তারা আমাকে জব্দ করতে চেয়েছিল বটে, কিন্তু আমার পক্ষে তা শাপে

বর হ'ল, জেলবাসের দুঃখের বদলে আমি ভগবানকে পেলাম্। সেই কথাটাই এখানে বিশেষ ক'রে বলবার।

কারাগারে আশ্রমবাস

জেলে কয়েদ ক'রে প্রথম একটি মাস শ্রীঅরবিন্দকে এক নির্জন কুঠরিতে রাখা হয়। হঠাৎ এমন নিষ্ঠুর শাস্তি সহ্য করা সব চেয়ে কঠিন। দিনের পর দিন ধরে চব্বিশ ঘণ্টাই একলা একটি খাঁচার মধ্যে মুখ বুজে থাকা, কারো সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ বা কথাবার্তা নেই, জীবনে কোনো বৈচিত্র্য নেই, কোনো কাজ নেই, পড়বার একটা বই পর্যন্ত নেই (পরে যদিও পেয়েছিলেন), এ-ভাবে থাকতে পারা জানোয়ারদের পক্ষে সম্ভব হ'তে পারে কিন্তু একজন জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের পক্ষে নয়। এতে মানুষ পাগল পর্যন্ত হয়ে যায়, এমন অনেক শোনা গেছে। শ্রীঅরবিন্দও প্রথমে উতলা হয়েছিলেন, ভগবানের উপর বিশ্বাসটি তাঁর ভেঙে যাবার উপক্রম হয়েছিল। ভগবান তাঁর জীবনের ব্রতপালনের কাজে এমন বাধা দিলেন কেন? কিন্তু দু'একদিনের মধ্যেই তিনি তাঁর এ প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেলেন, "সবুর করো, এর কারণ পরে জানবে।" তখন তিনি কিছু আশ্বস্ত হলেন, ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগলেন। দিনকয়েক পরে হঠাৎ তাঁর উপলব্ধি এল, তখন মনে পড়ে গেল, কোথায় তাঁর কি কর্তব্যের ত্রুটি হয়েছে! এর আগে তিনি একবার ইঙ্গিত পেয়েছিলেন এই কাজ থেকে থেমে যাবার জন্য, কিন্তু সে ইঙ্গিত তিনি গ্রাহ্য করেননি। কাজের প্রতিই তাঁর অতিরিক্ত ঝোঁক এসেছিল কি?, ভেবেছিলেন

তিনি নিজে না করলে বুঝি এত উদ্যোগ সব নষ্ট হয়ে যাবে? এ যে তাঁর নিজের কাজ নয়, ভগবানের কাজ, তাঁকে দিয়ে কেবল করানো হচ্ছে, সেই কথাটা ভুলে গিয়েছিলেন? এই উপলব্ধির মধ্যে ভগবান এখন তাঁকে শুনিয়ে দিলেন, "তুমি কাজের উপর মমত্বটা সম্পূর্ণ ছাড়তে পারছিলে না ব'লে জোর ক'রে সেটা ছাড়িয়ে দিতে হ'ল। এর পরে তোমার অন্য কাজ রয়েছে, তারই বিষয়ে শিক্ষা দেবার জন্য তোমায় এখানে এনেছি।" তখন থেকে তিনি এই কারাবাসকে তাঁর সাধনার আশ্রমবাস ব'লে মনে করতে লাগলেন।

সর্বক্ষণ তিনি এক কোণে ব'সে ধ্যান করতেন, অন্য কোনো দিকে নজর দিতেন না। কেমন ক'রে ভগবানকে উপলব্ধি করা যায় এই তখন তাঁর একমাত্র লক্ষ্য হ'ল। একমাস পরে তাঁকে অন্যান্য সকলের সঙ্গে একত্রে রাখা হয়। সকলেই নিজেদের খেলাধূলা ও হাসি-তামাসায় রত থাকে, কিন্তু সেই দারুণ হট্টগোলের মধ্যেও শ্রীঅরবিন্দ থাকেন তাঁর ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে। তিনি জানতেন যে, এর মধ্যেই থেকে তাঁকে নিজের সাধনার কাজ ক'রে যেতে হবে। আদালতে যখন বিচারের কাজ চলেছে, তখন কে কি বলছে তার কোনো কথাই তিনি কানে নিচ্ছেন না, সেই বিচিত্র কলরবের মধ্যেও তাঁর ধ্যান চলেছে। চোখ চেয়েই ব'সে আছেন, তবু কিছুই তিনি দেখছেন না। পাশের লোকেরা পরস্পর বলাবলি করতে লাগল যে, শ্রীঅরবিন্দের চোখ দুটো হয়ে আছে যেন কাচের চোখ, চেতনার কোনো সাড়াই তার মধ্যে নেই। সকল সময়েই তাঁর এমনি নির্বিকার ভাবশূন্য অবস্থা, বাইরের দিকে হুঁশ নেই। নরেন গোস্বামীর হত্যার পরে আবার তাঁকে নির্জন কুঠরিতে ঢুকতে হয়,

তাতেও তাঁর আচরণের কোনো ইতরবিশেষ নেই। তিনি সর্বক্ষণ কেবল তাঁর ধ্যান নিয়েই থাকলেন।

ভগবান দর্শন

এবার শ্রীঅরবিন্দের ঐকান্তিক সাধনার ফলে তাঁর অভীপ্সিত সিদ্ধিলাভ ঘটল। তিনি যা চেয়েছিলেন তাই পেয়ে গেলেন। ভগবানের "সাক্ষাদ্দর্শন," এই ছিল তাঁর সবিশেষ আকিঞ্চন, এবার তাই-ই তাঁর ঘটে গেল। কারাগারের বাইরে থাকলে এটা এত শীঘ্র হ'ত কিনা বলা যায় না, কারণ তাঁকে কাজের মধ্যে এতই বেশি জড়িয়ে থাকতে হ'ত যে, ভগবানের সাধনায় এতটা নিবিষ্ট হবার সময় ও সুযোগ কখনই পেতেন না। সেইজন্যই তিনি পরে এ-কথা বলেছিলেন যে, জেলে আবদ্ধ থাকা তাঁর পক্ষে শাপে বর হয়ে গিয়েছিল।

ভগবানের দর্শন পাওয়া কথাটার মানে কি? সে কি কেবল স্বপ্নে কিংবা কল্পনায় দর্শন, ধ্যান করতে করতে একবারটি আচমকা কিছু দর্শন, বা হঠাৎ একটা অতীন্দ্রিয় দর্শন? তেমনও অনেকের হ'তে শোনা যায়। কিন্তু এ তা নয়, এ হ'ল স্বাভাবিক জাগ্রত অবস্থাতে সুস্থ মস্তিষ্কে সাদা চোখে সর্বত্র ভগবানকে দর্শন, সব কিছুতেই ভগবানকে প্রত্যক্ষ অনুভব করা। তাঁর নিজের ভাষাতেই বলছি, কারাগারের দুর্ভেদ্য পাঁচিলের দিকে তিনি চেয়ে দেখেন, সে আর সেই ইটের পাঁচিল নেই, তিনি দেখলেন স্বয়ং বাসুদেবই তাঁকে ঐভাবে ঘিরে রয়েছেন। তাঁর কুঠরির সামনের গাছটার দিকে যখন চাইলেন, দেখলেন যে, সেও সেই বাসুদেব, ডালপালা-

গুলোকে ছাতার মতো ছড়িয়ে স্নিগ্ধ ছায়া মেলে স্বয়ং তিনিই দাঁড়িয়ে আছেন। জেলের বন্ধ কবাটের গরাদগুলোর দিকে যখন চাইলেন, তাও সেই বাসুদেব। আবার বাইরের দ্বাররক্ষীর দিকে চেয়ে দেখেন, সেও তাই, স্বয়ং সেই বাসুদেবই তাঁকে পাহারা দিচ্ছেন। রাত্রে কুট্‌কুটে কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে তৎক্ষণাৎ মনে হ'ল কম্বলের বদলে স্বয়ং বাসুদেবই তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। জেলের মধ্যে যত সব খুনে ডাকাত চোর কয়েদী রয়েছে তারাও সবাই বাসুদেব, নানারকম প্রচ্ছন্ন দেহাবরণের আড়াল রেখে প্রত্যেকের ভিতর থেকে তিনিই উঁকি মারছেন। এমনি প্রত্যক্ষভাবে ভগবান তাঁকে দর্শন দিচ্ছেন সবের ভিতর দিয়ে। এমন কি যে বিচারক তাঁর মামলার বিচার করছেন তাঁর মধ্যেও রয়েছেন তিনি, আবার যে ব্যারিস্টার তাঁকে ফাঁসি দিতে চাইছেন তাঁর মধ্যেও তিনি।

তখন ভগবানকে ডেকে তিনি বললেন, "তুমি যদি সত্য হও তাহ'লে আমার মনের কথা সবই তুমি জানছ। তুমি জানো যে, আমি তোমার কাছে মুক্তি চাই না, বা আরো কোনো কিছু চাই না, আমি চাই কেবল আমার দেশের মুক্তি। এ দেশের মানুষদের আমি ভালোবাসি, ওদের জন্যই মুক্তি চাই, ওদের জন্যই নিজের জীবনকে উৎসর্গ ক'রে দিতে চাই।" এ কথার কোনো জবাব না পেয়ে তিনি আরো বেশি সাধনা করতে থাকলেন। মনে মনে বললেন, "ভগবান, তুমি আমায় কিছু আদেশ দাও, কিছু ইঙ্গিত কর, কোন্ কাজে আমাকে লাগাতে চাও তার কিছুই আমি জানতে পারছি না।" তখন উপর থেকে দুটি নির্দেশ এল। প্রথম নির্দেশে তিনি শুনলেন, "তোমাদের দেশের পতিত জাতিকে উঁচুতে ওঠাও,

এই তোমার একটা কাজ হ'ল। অল্পদিনের মধ্যেই তুমি ছাড়া পাবে, তখন থেকে তুমি এই কাজ শুরু করবে।" দ্বিতীয় নির্দেশ এল, "এক বছর একান্ত নির্জনে রেখে তোমায় কিছু শিক্ষা দেওয়া গেল। সনাতন ধর্ম সম্বন্ধে তোমার যা-কিছু সন্দেহ ছিল তা ঘুচিয়ে দেওয়া হ'ল। বাইরে গিয়ে এবার এই সনাতন ধর্মের কথা দেশের লোককে শোনাবে, আর বলবে যে, জগতে এই ধর্ম প্রচারের জন্যই তাদের এবার স্বাধীন ক'রে দিয়ে জগৎসমাজে বড়ো ক'রে তুলছি। তারা যে স্বাধীনতা পাবে তা কেবল নিজেদেরই সুবিধার জন্য নয়, সারা জগতের কাজ করবার জন্য ও প্রকৃত সেবা করবার জন্য।"

এগুলি সবই শ্রীঅরবিন্দের নিজের বলা কথা। এগুলি মিথ্যা বলা কিংবা বাড়িয়ে বলা মনে করলে ভুল হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে, যিনি বলেছেন তিনি সামান্য লোক নন, আর মিথ্যা বলার দৃষ্টান্ত তাঁর জীবনে কখনো দেখা যায়নি। বরাবর তিনি ইউরোপীয় সায়ান্সের নিখুঁত সত্যবাদিতার আবহাওয়ায় থেকে মানুষ হয়েছেন, সত্য বলা তাঁর চিরদিনের অভ্যাস। ধোঁয়াকে তিনি ধোঁয়াই বলতেন, ধোঁয়া দেখেই আগুন বলে চেঁচিয়ে উঠতেন না। তিনি যে যথার্থ সত্য কথাই বলেছেন এটুকু অন্তত আমাদের মেনে নিতে হবে।

এখানে শ্রীরামকৃষ্ণের কথাটি একবার স্মরণ করা যাক। তিনিও বলেছিলেন, মৃন্ময়ী প্রতিমার মধ্যে প্রাণময়ী কালী মাকে তিনি দেখেছেন, নিজে হাতে তাঁকে খাইয়ে দিয়েছেন। মিথ্যা কথা তিনিও বলেননি। বাসুদেবই বলি কিংবা মাই বলি, আমরা অবশ্য তেমন-ভাবে তাঁকে দেখতে পাই না। এঁরা কিন্তু বলেছেন, তিনি সবের

মধ্যেই আছেন, তবে তিনি প্রচ্ছন্ন হয়ে আছেন, তাই আমাদের সাধারণ দৃষ্টিতে তাঁকে দেখা যায় না। থিয়েটারে যখন কোনো পুরুষ অভিনেতা নারী সাজে এবং নারীর পার্ট করে, তখন আমরা সাধারণ চোখে তাকে নারী বলেই দেখি, বাইরের সাজপোশাকের আড়ালে যে পুরুষটি লুকিয়ে আছে তাকে আমরা চিনতেই পারি না। কিন্তু যার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আছে সে তৎক্ষণাৎ চিনে ফেলে। তেমনিভাবে সাধারণের চেয়ে অতিরিক্ত দৃষ্টিশক্তি যার এসে গেছে সে সবের মধ্যেই ভগবানকে দেখতে পায় এবং চিনতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণ যে বলতেন, "তোদের চৈতন্য হোক," একেই বলে সেই চৈতন্য হওয়া।

এঁদের কেমন ক'রে সেই চৈতন্য হয়েছিল? অন্তরের অকপট ভালোবাসার দ্বারা। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর কালী মাকে সত্যই প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন, তিনি বলতেন যে, মাকে ভক্তি করা ছাড়া আমি আর কিছুই চাই না। তার থেকেই তাঁর এই চৈতন্য এল, জ্ঞান এল, নিরক্ষর হয়েও তিনি সব কিছু জানলেন। শ্রীঅরবিন্দও তাঁর দেশরূপিণী মাকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলেন, তাঁকে ভক্তি করা এবং তাঁকে মুক্ত করা ছাড়া তিনি আর কিছু চাইতেন না। মহাজ্ঞানী হয়েও তাঁর যে চৈতন্য আসেনি, এই ভক্তি ও ভালোবাসার জোরেই তাঁর সে চৈতন্য এসে গেল। প্রথমে একজনকে ভালোবাসা, তার পরে অনেককে, তার পরে ভগবানকে। ভালোবাসা এখানে ধাপে ধাপে এগিয়ে গেল। যে অমন ক'রে ভালোবাসতে পারবে তারই ভগবানকে দেখতে পাবার শক্তিও আসবে। মানুষের জীবনে ভালোবাসাই হ'ল চোখ ফোটাবার প্রথম ধাপ। আর প্রথমে মাকে ভালোবাসাই সবচেয়ে সোজা। শ্রীঅরবিন্দ এই কথাই বারবার বলেছেন।

কারামুক্তি

শ্রীঅরবিন্দ যখন জেল থেকে বেরিয়ে এলেন তখন সবাই দেখলে তিনি একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেছেন। তখন আর তিনি দেশোদ্ধারের কথা কিংবা বিপ্লবের কথা বলছেন না, কেবলই বলছেন বাসুদেবের কথা, ভগবানের কথা। উত্তরপাড়ায় ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বললেন—

"জেলখানায় থাকতে ভগবানের নিজের মুখের বাণী আমি শুনে এসেছি। দেশের সম্বন্ধে আমায় ভাবতে দেখে তিনি বলেছিলেন, 'তোমার এত ভাবনা কিসের ? এখন তুমি দেখতেই পাচ্ছ যে, সবার মধ্যেই আমি রয়েছি, তোমাদের এই দেশমুক্তির চেষ্টার মধ্যেও আমি আছি। যারা দেশের জন্য লড়ছে তাদের মধ্যেও আমি, যারা তাতে বাধা দিচ্ছে তাদের মধ্যেও আমি। প্রত্যেকের দ্বারাই আমার কাজ চলছে। তা ছাড়া, কারো অন্য কিছু করবার উপায় নেই। ওরাও আমার শত্রু নয়, ওরা আমার যন্ত্র।' এ-কথা শোনবার পরে আর আমি বলব না যে, জাতীয়তাই আমাদের ধর্ম। এখন বলব যে, সনাতন ধর্মই আমাদের খাঁটী জাতীয়তা। এই সনাতন ধর্মের উত্থানেই জাতির উত্থান, এর পতনেই জাতির পতন।"

কিন্তু এই সকল কথা শুনতে লোকের ভালো লাগল না। জাতীয়তাবাদীরা অবশ্য তাঁকে খুবই চেনে, তারা বুঝলে যে, দেশকে তিনি কোন্ পথে অগ্রসর করাতে চাইছেন। কিন্তু অনেকে ভাবলে যে, শ্রীঅরবিন্দ এবার ভয় পেয়ে গেছেন, তাই বিপ্লবের বুলি বদ্‌লে দিয়ে এখন ধর্মের বুলি শোনাচ্ছেন। বিভিন্ন সভায় দাঁড়িয়ে বিভিন্ন বক্তৃতায় তিনি কিন্তু পুনঃপুনঃ বললেন—

"রাত্রির অন্ধকার এবাব কেটে গেছে, ভোরের আলো দেখা দিয়েছে, এবার

শীঘ্রই হবে সূর্যোদয়। ভারতের ভাগ্যাকাশে এখন যে সূর্য উঠবে তার আলোতে সমস্ত ভারত প্লাবিত হবে, সমস্ত এশিয়া প্লাবিত হবে, সমস্ত জগৎ প্লাবিত হবে। ভগবানের তাই ইচ্ছা।"

কিন্তু এ কথার মর্মার্থ তখন কেউ বুঝলে না।

"কারা কাহিনী"

জেল থেকে আসার পরে তিনি তাঁর অপূর্ব "কারা কাহিনী" লিখেছিলেন, সেটি পরে বই হয়ে বেরোয়। সেই ছোট বইখানি পড়লেই বোঝা যায় যে, তিনি বাঙালী ছেলেদের কতখানি প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন, কতটা ভবিষ্যৎ আশার দৃষ্টিতে তিনি তাদের দেখতেন। আরো বোঝা যায় তাঁর সূক্ষ্ম রহস্যপ্রিয়তার কথা, বোঝা যায় যে, তিনি নিতান্ত গুরুগম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন না, শিশুর মতোই হাস্যপ্রিয় ছিলেন।

এ ছাড়া "Brain of India" নামে তিনি কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। তাতে বাঙালীদের উর্বর মস্তিষ্ক সম্বন্ধে তিনি অনেক কথাই বলেন। তিনি বলেছেন, চিন্তাশক্তিতে বাঙালী সকলের চেয়ে বড়ো, তার কারণ হৃদয় দিয়ে সে চিন্তা করে। বোঝবার শক্তিও তাদের প্রখর। তা ছাড়া, ইচ্ছাশক্তিও তাদের তেজালো, সেটা তারা পেয়েছে পুরুষানুক্রমে আধ্যাত্মিক শক্তিসাধনার ফলে। কিন্তু জ্ঞানের দিক দিয়ে তারা অনেক পিছিয়ে পড়েছে। তার কারণ সংযতভাবে তারা আর চিন্তা করে না। এ দোষ দূর করতে হ'লে আগে ব্রহ্মচর্যের দ্বারা জীবনের ভিৎ গড়ে নেওয়া দরকার। আগেকার কালে তাই করা হ'ত।

"কর্মযোগিন্" ও "ধর্ম" পত্রিকা

জেল থেকে বেরোবার পরেও তিনি জাতীয়দলের নেতৃস্থানীয় হয়ে তাদের দলকে পুনর্গঠিত করেছিলেন। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এবার তাদের শাসনবিধির কিছু সংস্কার করতে চাইলে, মডারেটদের দল তার সমর্থন করলে, কিন্তু জাতীয়দলের তা মনঃপূত হ'ল না। এই নিয়ে তাদের সঙ্গে জাতীয়তাবাদীদের সংঘর্ষ বেধে যেত, কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ তা বাধতে দিলেন না। তিনি বললেন, ওরা যা করছে করুক। আমরা এবার অপেক্ষা করব। এই সময় "কর্মযোগিন্" ও "ধর্ম" নামে দু'টি সাপ্তাহিক পত্রিকা তিনি প্রকাশ করতেন, তার মধ্যে প্রথমটি ইংরেজী আর দ্বিতীয়টি বাংলা। তাতে তিনি যে সব কথা বলতেন, "ধর্ম" পত্রিকা থেকে খানিকটা উদ্ধৃত ক'রে দিলেই তা বোঝা যাবে—

"যেদিন বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' গান বাহ্যেন্দ্রিয় অতিক্রম করিয়া প্রাণে আঘাত করিল, সেইদিন আমাদের হৃদয়ের মধ্যে স্বদেশপ্রেম জাগিল, মাতৃমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইল।...এই মাতৃপ্রেম, মাতৃমূর্তি জাতির মনে-প্রাণে জাগরিত ও প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এই কয় বর্ষের উত্তেজনা, উদ্যম, কোলাহল, অপমান, লাঞ্ছনা, নির্যাতন ভগবানের বিধানে বিহিত ছিল। সেই কার্য সম্পন্ন হইয়াছে। তাহার পরে কি?

"তাহার পরে আর্যজাতির সনাতন শক্তির পুনরুদ্ধার।...যে মহৎ কার্য সমাধা করিতে হইবে, তাহা কেবল উত্তেজনার দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না, শক্তি চাই। সেই শক্তি তোমাদের শরীরে অবতরণ করিতে উদ্যত হইতেছেন। সেই শক্তিই মা। তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিবার উপায় শিখিয়া লও। মা তোমাদিগকে যন্ত্র করিয়া এত সত্বর, এমন সবলে কার্য সম্পাদন করিবেন যে,

জগৎ স্তম্ভিত হইবে। এখন অন্তর্নিহিত মাতাকে আত্মসমর্পণ কর। কার্যোদ্ধারের অন্য পন্থা নাই।"

এই ধরনের কথাই তিনি তখন লিখতেন। কিন্তু তাতেও ব্রিটিশ কর্তাদের সন্দেহ গেল না। তখনও মাঝে মাঝে গোপন বিপ্লবীদের রাজপুরুষ হত্যা ও ডাকাতি করা প্রভৃতির ব্যাপার চলেছে, আর ওরা ভাবছে শ্রীঅরবিন্দ নিশ্চয় তার মধ্যে জড়িত আছেন। ওরা তাঁকে কোনো উপায়ে গ্রেপ্তার ক'রে চালান দেবার ছুতো খুঁজতে লাগল। সিস্‌টার নিবেদিতার মুখে এই কথা শুনে তিনি "কর্মযোগিন্" কাগজে একটি প্রবন্ধ ছাপলেন, তার নাম "দেশবাসীর প্রতি খোলা চিঠি"। তাতে তিনি দেশবাসীদের সম্বোধন ক'রে বললেন, দেশের নেতা হয়তো বদ্‌লে যেতে পারে, তাতে স্বাধীনতাকামীদের বিচলিত হ'লে চলবে না। ভবিষ্যতে তাদের জন্য স্বয়ং ভগবান নিশ্চয় কোনো উপযুক্ত নেতা পাঠাবেন, সেই ঈশ্বরপ্রেরিত নতুন নেতার জন্য তাদের অপেক্ষা করতে হবে। এর থেকে বোঝা গেল যে, তিনি নিজের নেতৃত্ব এবার ছেড়ে দিতে চাইছেন। এতে ব্রিটিশ কর্তাদের মতলবটা আপাতত চাপা পড়ে গেল বটে, কিন্তু তবু মাঝে মাঝে নানারকম গুজব উঠতে থাকল।

চন্দননগরে গমন

শ্রীঅরবিন্দের নামে ওয়ারেণ্ট বের করা হচ্ছে, এই ধরনের উড়ো খবর প্রায়ই তাঁর কাছে আসত, সেটা তিনি গ্রাহ্যই করতেন না। জানতেন যে, তা মিথ্যা গুজব। কিন্তু ১৯১০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যখন তিনি "কর্মযোগিন্" অফিসে বসে আছেন, তখন একজন

সেখানে হঠাৎ এসে তাঁকে খবর দিলে যে, অফিস খানাতল্লাসি করা হবে, সেই সঙ্গে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে, এই কথা সে শুনে এসেছে। প্রথমে তিনি সে কথা অগ্রাহ্যই করলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই তিনি ভিতর থেকে স্পষ্ট একটি আদেশ শুনলেন, "তুমি এখনই চন্দননগরে চলে যাও"। একবার তিনি এই ধরনের আদেশকে উপেক্ষা করেছিলেন, কিন্তু এবার আর তা করলেন না। তখনই তিনি উঠে পড়লেন, দশ মিনিটের মধ্যেই দেশের নেতৃত্ব ও কাগজের সম্পাদনা প্রভৃতি সব কিছু ফেলে দিয়ে সংসারের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছেড়ে গঙ্গার ধারে গিয়ে একটি নৌকোয় চড়ে চন্দননগরে চলে গেলেন। এইভাবে সেদিন থেকে তিনি হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলেন, কেউ জানলে না তিনি কোথায় গেছেন। মাত্র চারটি বছরের জন্য বাংলাদেশের আকাশে উল্কার মতো দেখা দিয়ে আসমুদ্র হিমাচল পর্যন্ত তোলপাড় ক'রে দিয়ে হঠাৎ আবার উল্কার মতোই তিনি অন্তর্ধান করলেন।

পণ্ডিচেরী যাত্রা

চন্দননগরে মাত্র দেড় মাস তিনি ছিলেন শ্রীমতিলাল রায়ের আশ্রয়ে। সেখানে সর্বক্ষণই তিনি ধ্যানে মগ্ন থাকতেন, কেউই তাঁর খবর জানত না, এমন কি গুপ্তচরেরাও না। দেড় মাস পরে আবার তিনি আদেশ পেলেন, "তুমি পণ্ডিচেরীতে যাও"। সেই আদেশটিও পালন করতে তিনি কিছুমাত্র বিলম্ব করলেন না। তখনই কলকাতায় ফিরে ছদ্মনামে এক জাহাজে চড়ে পণ্ডিচেরী যাত্রা করলেন।

চন্দননগরে তিনি বেশ নিরাপদেই ছিলেন, তাঁর নীরব সাধনার

কাজে কোনো ব্যাঘাত হয়নি। তবু, সেখান থেকে আবার পণ্ডিচেরীতে চলে যেতে আদেশ হবার কারণ কি? এ প্রশ্নের জবাব অবশ্য তখন দেওয়া যেত না, কিন্তু এখন দেওয়া যায়। সে জবাব এর পরের পর্বেই পাওয়া যাবে। এই ব্যাপারটি হয়তো আমাদের কাছে অদ্ভুত মনে হ'তে পারে, কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের কাছে তা হয়নি। তিনি বুঝেছিলেন যে, সেখানে গিয়ে একটা বিশেষ কিছু ঘটাবার আছে, ভগবান সেখানেই এবার তাঁকে দিয়ে একটা বিশেষ রকমের কিছু করিয়ে নেবেন। তিনি যে ভগবানেরই হাতের যন্ত্র মাত্র, এ কথা আর কখনই তিনি ভোলেননি।

পঞ্চম অঙ্ক

পণ্ডিচেরী পর্ব (চল্লিশ বছর)

পণ্ডিচেরী কোথায়?

শ্রীঅরবিন্দ সামান্য একজন অজ্ঞাত ব্যক্তির মতো পণ্ডিচেরীতে গিয়ে নামলেন ১৯১০ সালের ৪ঠা এপ্রিল তারিখে। তিনি যখন যান তখন ওখানে উল্লেখযোগ্য কিছুই নেই। ঐস্থান দক্ষিণ ভারতের এক প্রান্তে সমুদ্রতীরে ফরাসীদের অধিকৃত একটি ছোটোখাটো বন্দর, তারই কোলে একটি নগণ্য শহর। স্থানীয় লোকেরা ছাড়া কয়েকজন ফরাসী রাজপুরুষ সেখানে বাস করে। তাদের সৈন্যসামন্ত নেই, কেবল ফরাসী পুলিসের সাহায্যে ফরাসীদের জমিদারীটুকু রক্ষা করে। এ ছাড়া, ভারত থেকে পলাতক নানারূপ আসামীদের সেটা ছিল এক আড্ডা! সেই পণ্ডিচেরীকে জগতের কেই-বা তখন চেনে? শ্রীঅরবিন্দ সেখানে যাবার মাত্র চল্লিশ বছর পরে এখন কিন্তু সেই জায়গাটি সারা জগতের মানুষের কাছে এক মহাতীর্থস্থান হয়ে উঠেছে। সারা বছর ধরে জগতের সকল দেশের যাত্রীরা দলে দলে সেখানে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দের সমাধির কাছে নতজানু হয়ে তার উপর ফুলের অর্ঘ্য দিয়ে আসে। শ্রীঅরবিন্দের নামে সেখানে এক বিরাট আশ্রম ও বিরাট ইউনিভার্সিটি গড়ে উঠেছে। সকল দেশের শিক্ষার্থীরা সেখানে জড়ো হয় শ্রীঅরবিন্দের দেওয়া শিক্ষা গ্রহণ করতে।

প্রায় নিঃসম্বল অবস্থাতে শ্রীঅরবিন্দ উঠলেন গিয়ে শ্রীনিবাসচারী নামক একজন দেশভক্তের আশ্রয়ে। সঙ্গীরূপে প্রথমে ছিলেন চারজন, শ্রীনলিনী গুপ্ত, সুরেশ চক্রবর্তী, বিজয় নাগ ও সৌরীন্দ্র বসু। শ্রীনিবাসচারী খুব যত্ন করেই এঁদের থাকবার বন্দোবস্ত ক'রে দিলেন। কিন্তু অর্থের অভাবে বহুদিন পর্যন্ত এঁদের অতি কষ্টে দিনযাপন করতে হয়েছিল। প্রথমটায় শ্রীঅরবিন্দ কাউকে জানাননি যে, তিনি কোথায় রয়েছেন। তিনি চলে আসার কিছুকাল পরে "কর্মযোগিন্" পত্রিকার কোনো একটি প্রবন্ধের জন্য তাঁর নামে ওয়ারেণ্ট বেরোয়, এবং ঐ পত্রিকার মুদ্রাকরকে আদালতে অভিযুক্ত করা হয়। কিন্তু আদালতে প্রমাণ হয় যে, সেই প্রবন্ধে আইনবিরুদ্ধ ও রাজদ্রোহসূচক কিছুই নেই। এর পরে শ্রীঅরবিন্দ ফরাসী কর্তৃপক্ষের কাছে নিজের পরিচয় দিয়ে জানিয়ে দেন যে, তিনি পণ্ডিচেরীতে বাস করছেন।

ধরে আনার চেষ্টা

খবর পাবার পর থেকেই ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট অনবরত চেষ্টা করতে থাকল তাঁকে নিজেদের এলাকার মধ্যে কোনোগতিকে ধরে আনবার জন্য। ঐ মারাত্মক বিদ্রোহী মানুষটাকে কিছুমাত্র বিশ্বাস নেই, ঐখান থেকেই হয়তো ভারতের বিপ্লবীদের উস্কে দিতে থাকবে, কিংবা হয়তো সাংঘাতিক বোমা তৈরি ক'রে চালান করতে থাকবে, কিছুই বলা যায় না। এমন লোককে নিজেদের হাতের বাইরে থাকতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। কাজেই বহুকাল পর্যন্ত ওরা তাঁকে ধরে আনবার চেষ্টায় রত ছিল, সেখানে আদৌ তাঁকে শান্তিতে

থাকতে দেয়নি। প্রথমত, ওখানকারই স্থানীয় একজন ব্যক্তিকে নিয়ে মতলব করা হ'ল যে, কয়েকজন গুণ্ডা লাগিয়ে তাঁকে ধরে ফরাসী সীমানার বাইরে এনে ফেলা হবে, তার পরেই পুলিসের দ্বারা গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নানা কারণে এ মতলবটি ফেঁসে গেল।

আবার কিছুকাল পরে তাঁরই কোনো আত্মীয়ের মারফতে তাঁকে বলা হয় যে, তিনি এবার স্বচ্ছন্দে বাংলাদেশে ফিরে আসুন, গভর্নমেণ্ট কথা দিচ্ছে যে, তাঁকে গ্রেপ্তার করা বা কোনোরকমে বিরক্ত করা হবে না। এ প্রস্তাবে তিনি রাজী হলেন না। পুনরায় একজন বড়ো কর্মচারীকে সেখানে পাঠিয়ে প্রস্তাব করা হ'ল যে, তিনি ভারতে ফিরে এসে যেখানে খুশি থাকুন, কিংবা দার্জিলিংএ আরামে থেকে নিশ্চিন্তে বসে যোগ করুন বা লেখাপড়ার চর্চা করুন, গভর্নমেণ্ট দার্জিলিংএ তাঁর জন্য একটা আলাদা বাড়ি দিয়ে দেবে, আর খাবার থাকবার সকল বিষয়েই সুবিধা ক'রে দেবে। অর্থাৎ কোনোগতিকে নিজেদের কোটের মধ্যে এনে ফেলবার চেষ্টা। বলাবাহুল্য এতেও শ্রীঅরবিন্দ রাজী হলেন না, তিনি বললেন পণ্ডিচেরী থেকে তিনি এক পা নড়বেন না। তখন গুপ্তচর লাগিয়ে সর্বক্ষণ তাঁকে নজরে নজরে রাখা ছাড়া আর কোনো উপায় রইল না। এর পর ফরাসী রাজদরবারে খাস প্যারিসেও একবার চেষ্টা করা হ'ল যাতে তারাই শ্রীঅরবিন্দকে পণ্ডিচেরী থেকে তাড়িয়ে দেয়। কিন্তু এ প্রস্তাবও কার্যকরী হ'ল না।

কিছুকাল পরে হঠাৎ ব্রিটিশ গুপ্তচরেরা গুজব রটালো যে, শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর সঙ্গীরা গোপনে গোপনে ওখানে বিপ্লবের কাগজ-

পত্র ছাপছে আর বোমা তৈরি করছে। ওখানকার ফরাসী শাসন-কর্তাদের কাছে গিয়ে তারা মহা আড়ম্বরের সঙ্গে এই খবর জানিয়ে দিলে। কিন্তু ফরাসী পুলিস ওঁর বাড়িতে ঢুকে রীতিমত খানাতল্লাসি ক'রে কোনো কিছুই পেলে না। পেলে কেবল কতকগুলো সংস্কৃত ভাষার এবং ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষার বই। তবুও এদের হাত থেকে তিনি সম্পূর্ণ রেহাই পাননি। কংগ্রেসের হাতে কতকটা শাসনভার এসে পড়ার পর থেকে এই উপদ্রব ঘুচল।

ফিরিয়ে আনার চেষ্টা

দেশের লোকেরাও তাঁকে আবার দেশের কাজে লাগবার জন্য ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করেছিলেন। লোকমান্য তিলক একবার লোক পাঠিয়ে তাঁকে অনুরোধ কবলেন, এবার তিনি ফিরে আসুন, তাঁকে নতুনরকম জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হ'তে হবে। এতেও তিনি সম্মত হলেন না। সরলা দেবী একবার যান তাঁকে ফিরিয়ে আনতে, তিনিও তাতে সফল হননি। বোম্বাইএর দেশসেবক ব্যাপটিস্টা নতুন একটি জাতীয় পত্রিকা বের ক'রে তার সম্পাদক হবার জন্য তাঁকে আহ্বান করলেন। তাঁর চিঠির উত্তরে তিনি লিখলেন, "আমার হাতে এখন অনেক কাজ, যাবার উপায় নেই। যে কাজের জন্য আমি এখানে এসেছি তা যতক্ষণ পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে সফল না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এই স্থান ছেড়ে কোথাও যাব না। এই হ'ল আমার তপস্যার স্থান, আর সেই তপস্যার কাজ আমার অন্তরস্থ আত্মার নির্দেশে।" দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনও একবার চেষ্টা করেছিলেন শ্রীঅরবিন্দকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনতে, তিনিও তাতে সফল হননি।

শ্রীঅরবিন্দ ওখানে কি কাজ করছিলেন?

পণ্ডিচেরীতে সেই যে তিনি চলে গেলেন, তার পরে আর কখনো ফিরলেন না। পণ্ডিচেরী ছেড়ে প্রকৃতপক্ষে আর এক পাও তিনি নড়লেন না। সুদীর্ঘ চাল্লিশটি বছর, অর্থাৎ জীবনের অর্ধেকের চেয়েও বেশি সময় তিনি ঐ এক জায়গাতে এক ভাবে থেকে কাটিয়ে দিলেন। সাধারণ মানুষ প্রশ্ন করবে, এতকাল পর্যন্ত তিনি সেখানে বসে কি করছিলেন, কোন্ কাজে তিনি এমন ঐকান্তিকভাবে নিযুক্ত ছিলেন? স্থূল বাস্তবের দিক থেকে এ কথার জবাব দেওয়া কঠিন, কারণ এর পরে তাঁর যা কাজ তা বাইরের দিক থেকে স্থূল দৃষ্টিতে দেখা যায় না। সে কাজ একেবারেই তাঁর অন্তরের চেষ্টার কাজ। কিন্তু চোখে দেখা না গেলেও এ কাজের পরিমাপ ও গুরুত্ব তাঁর আগেকার সব কাজের চেয়েও অনেক বেশি। এ কাজ তাঁর দেশসেবার কাজের চেয়েও আরো অনেক বেশি কঠিন। সেই কঠিন আভ্যন্তরীণ কাজগুলি করতে করতে তিনি কখন কোন্ পথ দিয়ে কতখানি অগ্রসর হয়ে চলেছেন, পর্বতচূড়ার উপরে ওঠার দুর্গম-পথ খুঁজে চলতে চলতে তিনি কতই উপরে উঠে গেছেন, বাইরের থেকে আমরা তা কেমন ক'রে বলতে পারি? তিনি নিজেই কেবল সে কথা বলতে পারতেন, কিন্তু নিজে কখনো তা ব্যাখ্যা ক'রে বলেননি। যখন বলেছেন তখন তাঁর পরিশ্রমের কথাটা বাদ দিয়ে কেবল ফলগুলির কথাই বলেছেন। সেইগুলিই এখন আমরা কতকটা বলতে পারি। আর এও বলতে পারি যে, তিনি যা কিছু করেছেন তা আমাদেরই জন্য।

সবাই এখন জানে যে, সেখানে তিনি দিনের পর দিন, বছরের পর বছর কেবল যোগের কাজই করেছিলেন, তপস্যাই করেছিলেন।

কিন্তু তা এত কেন ? যিনি তিন দিনের মধ্যে ব্রহ্মানুভূতি পেয়েছেন, জেলে ব'সে ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন পেয়েছেন, তাঁর কি সাধনাতে সিদ্ধিলাভ বা মুক্তিলাভ করতে খুব বেশি সময় লাগে ? কিন্তু তাতেই যে তাঁর কাজ চলবে না। নিজে মুক্তি পেয়ে তিনিই না হয় আনন্দে থাকলেন, কিন্তু জগতের সকলের কি হবে ? সেই আনন্দকে তিনি আমাদের সকলের জন্য নামিয়ে আনতে চান, সেই আনন্দের অবস্থাতে তিনি সকলকে উঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে চান। এই কাজই ভগবান তাঁর জন্য নির্দিষ্ট ক'রে দিয়েছেন, এই তাঁর পক্ষে সেই বড়ো কাজ, নিজের মুক্তি লাভ মাত্রই নয়। সেই বৃহত্তর কাজের জন্যই তাঁর এত কঠিন তপস্যা।

অবশ্য চব্বিশ ঘণ্টাই যে তিনি চোখ বুজে ব'সে ধ্যান করতেন তা ঠিক নয়। খাবার সময় তিনি খেতেন, ঘুমোবার সময় ঘুমোতেন, চায়ের টেবিলে সঙ্গীদের সঙ্গে কথাবার্তাও বলতেন, মাঝে মাঝে বইও পড়তেন। আগে তিনি বেদ পড়েননি, এই সময়ে বেদগুলি সব পড়ে নিলেন। কিন্তু বাইরে যাই করুন, মন তাঁর সব সময়ে যোগের কাজে লেগে থাকত। চোখ বুজে তাঁকে সব সময়ে বসতে হ'ত না, চোখ চেয়ে ধ্যান করতেও তিনি খুবই অভ্যস্ত ছিলেন। এমনি ভাবে একে একে চারটি বছর কেটে গেল, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটনা ঘটেনি। কয়েকজন বন্ধু ব্যতিরেকে কারো সঙ্গে তিনি মিশতেনও না, কাউকে চিঠিপত্রও কিছু লিখতেন না।

শ্রীমায়ের প্রথম দর্শন

ঠিক চারটি বছর পরে ১৯১৪ সালের এপ্রিল মাসে মা এলেন ফ্রান্স দেশ থেকে পণ্ডিচেরীতে, তখন তিনি মীরা রিশার। তাঁর

স্বামীর কাছে তিনি শুনেছিলেন যে পণ্ডিচেরীতে একজন মহা সাধু এসে রয়েছেন। ছেলেবেলা থেকে তিনি নিজেই ছিলেন একজন খুব উঁচুদরের সাধিকা, বাল্য-বয়স থেকেই স্বপ্নে তিনি অনেক সাধু মহাত্মার দর্শন পেতেন। আর তিনিও মনে জানতেন যে, জগতের লোককে দুর্গতি থেকে রক্ষা করতে তিনি এখানে এসেছেন। বরাবরই তাঁর একটা ইচ্ছা ছিল যে, যেখানেই সন্ধান মিলবে সেখানেই গিয়ে তিনি জগতের শ্রেষ্ঠ সাধুকে একবার স্বচক্ষে দেখবেন। ভারতে একবার আসার ইচ্ছাও তাঁর বরাবরই ছিল। এখন এমন একজন সাধুর খবর পেয়েই তিনি স্বামীর সঙ্গে পণ্ডিচেরীতে চলে এলেন। ভারতের মাটিতে পা দিয়েই তাঁর মনে হয়েছিল, এই দেশটাই যেন তাঁর যথার্থ নিজের দেশ, এখানেই তাঁর আত্মার বিকাশের ক্ষেত্র। তার পরে পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দকে দেখেই তিনি অবাক হয়ে গেলেন। এ যে তাঁর নিতান্ত চেনা মুখ, ছেলেবেলা থেকে কতবার স্বপ্নে তিনি যে এঁকেই দেখেছেন! কৃষ্ণের নামটা তিনি ইতিপূর্বে শুনেছিলেন, এঁকে তিনি কৃষ্ণ ব'লেই মনে করতেন। এখন চাক্ষুষ দেখে ও কথা কয়েই বুঝলেন ইনি একজন প্রকৃত মহাপুরুষ। পরের দিনের তারিখের নিজের ডায়েরিতে তিনি এই কথাগুলি লিখেছিলেন—

"কাল যাঁকে আমরা দেখেছি, তিনি তো সশরীরেই মাটির পৃথিবীতে এসে রয়েছেন। তবে আর ভাবনা কিসের, যদিও শত শত মানুষ অজ্ঞানের মোহে আজও ডুবে রয়েছে বটে? হে প্রভু, এঁকে যে তুমি এখানে পাঠিয়ে দিয়েছ, তাতেই প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে যে, এমন দিন এবার এল বলে, যেদিন সকল অন্ধকার আলোয় রূপান্তরিত হবে, যেদিন এই মর্ত্যের জগতে এবার তোমারই দিব্যরাজ্য গড়ে উঠবে।"

এর পরে শ্রীঅরবিন্দ এবং মা ক্রমশ পরস্পরের আরো ঘনিষ্ঠ সংযোগের ফলে দেখলেন যে, এঁরও যেমন সাধনা ওঁরও তেমনি সাধনা, এঁরও জীবনের যা আদর্শ ওঁরও তাই, ইনিও যে কাজ করতে চান উনিও তাই চান। ইনিও চান জগতের সকল মানুষের আধ্যাত্মিক রূপান্তর, উনিও চান তাই। ইনিও ভারতে থেকে সেই কাজ করতেন, উনিও ভারতে এসে তাই শুধু করতে মনস্থ করলেন।

এ-কি আশ্চর্য যোগাযোগ! এখন বোঝা যাচ্ছে, শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরীতে হঠাৎ চলে আসবার একটি কারণই হ'ল এই, ওখানে তিনি না গেলে এ মিলন ঘটতে পারত না। বস্তুত হঠাৎ একটা আপন খেয়ালের বশে তিনি পণ্ডিচেরীতে চলে আসেননি। এটিও যেন আগের থেকে স্থির করা ছিল। শোনা যায় যে, এর প্রায় ত্রিশ বছর আগে এক তামিল যোগী তাঁর শিষ্যকে ব'লে রেখেছিলেন যে, "উত্তরপ্রদেশ থেকে এক মহাযোগী দক্ষিণ-ভারতের এই সমুদ্রতীরে এসে পূর্ণ যোগের সাধনা করবেন। তাঁর তিনটি বিশেষত্ব (অর্থাৎ পূর্বোক্ত তিনটি 'পাগলামী') সকলের জানা থাকবে, তুমি তাঁর কাছে গিয়ে দীক্ষা নিও।" ত্রিশ বছর পরে সেই শিষ্য ওখানে গিয়ে খুঁজে খুঁজে শ্রীঅরবিন্দকে চিনতে পারে এবং তাঁকে তখন সব কথা ব'লে শিষ্যত্ব গ্রহণ করে।

যাই হোক ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় হবার পর থেকে মা আপাতত পণ্ডিচেরীতেই বাস করতে থাকলেন।

"আর্য" পত্রিকা

অতঃপর মা এবং তাঁর স্বামী দু'জনে মিলে শ্রীঅরবিন্দের কাছে প্রস্তাব করেন যে, তাঁর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও দার্শনিক মতবাদের সম্যক

প্রচার হওয়া দরকার, তার জন্য ভালো একটি অধ্যাত্মবিষয়ক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করা হোক, তার সমস্ত খরচটা তাঁরাই যোগাবেন। শ্রীঅরবিন্দ এতে সম্মতি দেওয়াতে ১৯১৪ সালেই তাঁর জন্মদিনে প্রথম "আর্য" পত্রিকাটি প্রকাশ করা হয়। এই পত্রিকার নামকরণ উপলক্ষে শ্রীঅরবিন্দ তাতে লেখেন যে, 'আর্য' কথাটির মানে নির্দিষ্ট কোনো একটা জাতি নয়। যিনি সব কিছু বাধাকে জয় করতে চান তিনিই আর্য। ভিতরে কিংবা বাইরে তাঁর উন্নতির পথে বাধা দেবার জন্য যত রকমের শত্রু আছে, তাদের যিনি পরাস্ত ক'রে চলেন তিনিই আর্য। এই পত্রিকার আলোচ্য বিষয়গুলি ছিল নানারূপ দার্শনিক তত্ত্ব, ভারতের বেদ-বেদান্ত ও উপনিষদের ইংরেজী অনুবাদ, নানাজাতীয় ধর্মের তুলনামূলক বিচার, আত্মজ্ঞান লাভের ও আধ্যাত্মিক উন্নতির বিবিধ নির্দেশ। সাতটি বিভিন্ন পর্যায়ে প্রতি মাসে শ্রীঅরবিন্দ নিজেই সমস্ত প্রবন্ধগুলি লিখতেন। এই পত্রিকার একটি ইংরেজী ও একটি ফরাসী সংস্করণ ছিল, ফরাসী পত্রিকাটির ভার নিয়েছিলেন মা এবং তাঁর স্বামী। সেই ফরাসী সংস্করণ মাত্র সাতটি বেরিয়েই বন্ধ হয়ে যায়, কারণ ইউরোপে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হওয়াতে ১৯১৫ সালেই মায়ের স্বামীর কাছে যুদ্ধে যোগদান করতে ফ্রান্স থেকে আদেশ আসে, অগত্যা দু'জনকেই তখন দেশে ফিরে যেতে হয়।

তাঁরা চলে যাবার পরে ইংরেজী কাগজটি নিয়মিত প্রকাশ হ'তে থাকে। ক্রমে ক্রমে এর গ্রাহক সংখ্যাও অনেক বাড়ে এবং তার দরুন কিছু অর্থাগম হওয়াতে তখন শ্রীঅরবিন্দের আর্থিক অবস্থা আগের চেয়ে একটু সচ্ছল হয়। ঐ সময়ে দেশের অনেকেই

শ্রীঅরবিন্দের লেখা ব'লে এই "আর্য" পত্রিকাটি কিনতেন, কিন্তু পড়তেন ও বুঝতেন খুব অল্প লোকেই। সম্ভবত অধিকাংশ ক্ষেত্রে আলমারিতেই সেগুলি সাজান থাকত। ভালো ভালো গল্পের বই পড়তেই সময় হয় না, এইসব দুর্বোধ্য দার্শনিক তত্ত্ব পড়বার সময় কখন? কেউ কেউ অবশ্য যত্ন ক'রেই পড়তেন। তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বড়ো ভাই দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন একজন। তাঁর মুখে শোনা গেছে যে, "অরবিন্দ ঘোষ তাঁর প্রবন্ধগুলিতে এমন সব কথা বলছেন যা ইতিপূর্বে কেউ কখনো বলেনি। বেদ ও গীতা ও তন্ত্রের অপূর্ব সমন্বয় এতে করা হয়েছে।"

সাত বছর পর্যন্ত এই পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ করা হয়, তার পরে বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়। তখন শ্রীঅরবিন্দের কয়েকজন শিষ্য জুটে গেছে। তাদের কাছে তিনি নাকি বলেছিলেন যে, উপর থেকে যে আলো তিনি পেয়েছেন তার সামান্য মাত্রই "আর্য" পত্রিকাতে তিনি ব্যক্ত করতে পেরেছেন, সত্তর বছর ধরে লিখে গেলেও সে সব কথা ফুরোবার নয়। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সুরাট কংগ্রেসের পর থেকে তিনি যা কিছু বলতেন বা লিখতেন তা উপরকার অনুপ্রেরণায়। "আর্য" পত্রিকাতেও তিনি যা কিছু লিখতেন তা নিজের মনের ভাবনা দিয়ে লেখা নয়, বাক্যগুলি আপনা থেকেই তাঁর কলমের ডগায় এসে যুগিয়ে যেত, এ কথা তিনি নিজেই বলেছেন। তিনি আরো বলেছিলেন যে, এই সাতটি বছর তাঁর জীবনের কঠোর পরীক্ষা গেছে। উপর থেকে এত বেশি বিশ্ব-চেতনার চাপ সহ্য করতে হয়েছে এবং উপর থেকে তাঁর মধ্যে এত বেশি আলো এসে পড়েছে যে, একটু অসাবধান হ'লেই তাঁকে তা

ভেঙে চুরমার ক'রে দিতে পারত। ভগবানের দয়াতেই তিনি এতখানি পরীক্ষা সহ্য ক'রে যেতে পেরেছেন।

স্ত্রীর মৃত্যু

পণ্ডিচেরীতে যাবার পর থেকে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর আর দেখাসাক্ষাৎ হ'তে পারেনি। তার কারণ স্ত্রীকে সেখানে যাবার অনুমতি তিনি দেননি। ১৯১৮ সালে তাঁকে তিনি পণ্ডিচেরীতে যাবার অনুমতি করেন। সেই উদ্দেশ্যে মৃণালিনী দেবীও রাঁচি থেকে রওনা হয়ে কলকাতায় উপস্থিত হ'ন। কিন্তু কলকাতায় তখন ইনফ্লুয়েঞ্জার মহামারী চলেছে, তাতেই আক্রান্ত হয়ে এখানেই তিনি মারা যান। পণ্ডিচেরী পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছতে পারেননি।

মায়ের পুনরাগমন ও স্থিতি

মহাযুদ্ধ থেমে যাবার পরে আবার মা পণ্ডিচেরীতে ফিরে এলেন। ফিরে এসে তিনি যা দেখলেন তাতে মর্মাহত হলেন। শ্রীঅরবিন্দের বাসস্থানে সব কিছুরই ঘোর অব্যবস্থা চলেছে। তাঁর শরীর দুর্বল, নাইবার খাবার কোনো ঠিক নেই, নিয়মিতভাবে তাঁর যত্ন পরিচর্যা হয় না। তাঁর সঙ্গী কয়েকজনেরও সেই অবস্থা, কে কাকে দেখে, কে কার খোঁজ নেয়। অথচ শিষ্য ও সঙ্গী হয়ে আট দশজন লোক সেখানে একত্রে বাস করছে। তখন সেখানে আশ্রম ব'লেও কিছু নেই, কোনো কিছুই না। মা তখন নিজে সেখানে বাস করতে থেকে সব কিছুর ভার গ্রহণ করলেন। ঐ বাড়িতেই উপর তলার একটি ঘর নিয়ে তিনি থাকতে শুরু করলেন, আর সকল দিক দিয়ে একটা

সুব্যবস্থা ক'রে ফেললেন। শ্রীঅরবিন্দও তাঁর উপরে সকল কিছুর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন।

আশ্রম গঠন

ক্রমে ক্রমে মা সেখানে একটি আশ্রমের মতো গড়ে তুললেন। শিষ্য ও ভক্তদের সংখ্যা বাড়ছে দেখে পরে তিনি ঐ বাড়িটি ছাড়া আশ্রমের জন্য আরো বাড়ি সংগ্রহ করলেন। সমস্তই চলতে থাকল সুনিয়মে ও সুশৃঙ্খলায়। নিজে মা ইউরোপীয় বেশভূষা ছেড়ে শাড়ি পরলেন। মাছমাংস খাওয়া তো বহু পূর্বেই ত্যাগ করেছিলেন। তাঁরও ছিল অপূর্ব রকমের যোগশক্তি। পণ্ডিচেরীতে ফিরে আসবার কিছুকাল পরেই তিনি শ্রীঅরবিন্দের কাছে বলেন যে, তিনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন, বিনা রক্তপাতেই ভারত এবার স্বাধীন হবে, ব্রিটিশরা আপনা থেকেই ভারত ছেড়ে চলে যাবে। ভারত স্বাধীন হবার প্রায় ত্রিশ বছর আগে তিনি এই ভবিষ্যদ্বাণী করেন।

আশ্রমের ব্যবস্থা তখন কেমন ছিল তার একটি বিবরণ লিখেছিলেন আগেকার যুগের বিপ্লবী শ্রীঅবিনাশ ভট্টাচার্য। দ্বীপান্তর থেকে ফিরে তিনি ওরই কিছুকাল পরে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে সেখানে দেখা করতে যান। তিনি লিখেছেন—

"...আশ্রমে তখন মাত্র বার-তের জন ছেলে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ কাজ নিয়ে থাকত। কেউ কারো সঙ্গে কথা বলে না...আশ্রমটি একেবারে নিস্তব্ধ ও শান্ত। একটি স্নিগ্ধ পবিত্র ভাব আশ্রমটিকে জড়িয়ে আছে।...সকাল সাতটার সময় প্রথম ঘণ্টা বাজল—একে একে সবাই নীচের তলায় একটা বড় ঘরে গেল।...একটা বড় কেটলির মধ্যে চা রয়েছে, কয়েকটা কাপ-ডিশ

আছে। একটা বড় ট্রেতে টুকরা টুকরা পাঁউরুটি, কিছু বিস্কুট ও পাকা কলা রয়েছে। যার যা ইচ্ছা হবে নিজেই নিয়ে খাবে, কারো সঙ্গে কেউ কথা বলে না নিতান্ত দরকার না হ'লে।...বেলা ঠিক বারটার সময় আবার ঘণ্টা বাজে। সকলেই একে একে আসে সেই বড় ঘরটিতে ভাত খাবার জন্য। যত জন খাবে ঠিক ততগুলি আসন পাতা, জলের গ্লাস ও ভাতের থালা সাজানো, তরিতরকারি সমস্ত একেবারে দেওয়া আছে। গোলাকারে সকলে খেতে বসে, শ্রীঅরবিন্দের পাশেই আমি বসি। মীরা রিশার (এখন যিনি আশ্রম-মাতা), মিস্ হজ্সন ও একটি বাঙালী বাল-বিধবা, সবাই একত্রে খাওয়া হয়। মীরা রিশার ও মিস্ হজ্সন বাঙালী মেয়েদের মতই শাড়ি পরেন।...বেলা তিনটার সময় আবার চা খাবার ঘণ্টা পড়ে, সকালের মত সকলেই সেই ঘরে গিয়ে চা খায়।...রাত নটার সময় আবার ঘণ্টা বাজে ভাত খাবার জন্য।...প্রত্যেক দিন ঠিকমত ঘড়ি ধরে খাওয়া-দাওয়া, তার কোনো ব্যতিক্রম হয় না। খাবার ঘরটিতে আসন পাতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা, থালাবাসন মাজা, ইত্যাদি ঘরসংসারের কাজ কে করে, কখন করে, কে বা রান্নাবান্না করে, হাটবাজার করে, আমি তার কিছুই হদিস পাই না। কোনো কথাবার্তা নেই, শব্দ গোলমাল নেই, অথচ কি ক'রে এ সমস্ত কাজ হয় আমি তো ভেবেই পাই না।...পরে জানলাম, মীরা রিশারই মিস্ হজ্সনকে সকল বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকেন, খরচপত্র সমস্তই মীরা রিশারের হাতে।... *

বলা বাহুল্য এ সবই মায়ের ব্যবস্থা। তিনি আশ্রমটিকে এই ভাবেই তখন দাঁড় করাচ্ছিলেন। শ্রীঅবিনাশ ভট্টাচার্য মায়ের নিখুঁত বিবেচনার সম্বন্ধে ওরই মধ্যে বিশেষ উল্লেখ ক'রে বলেছেন যে, তিনি সেখান থেকে ফিরবার সময় মা পথের সম্বল দিতেও ভোলেননি, ট্রেনে আসতে আসতে যাতে খাবার কিছু অসুবিধা না হয় তাই তিনি টুকরি ভরে যথেষ্ট খাদ্যবস্তু সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিলেন।

শ্রীঅরবিন্দের 'আবিষ্কার'

শ্রীঅরবিন্দের ছোটো ভাই বারীন্দ্র যখন দ্বীপান্তর থেকে ফিরে এসে তাঁকে চিঠি লেখেন, তখন তার জবাবে তিনি একুশ পৃষ্ঠার এক লম্বা চিঠি দিয়েছিলেন। তার ভিতর থেকেও বোঝা যায়, এবং তাঁর কথাবার্তা ও তখনকার নানারূপ লেখার ভিতর থেকেও বোঝা যায় যে, ইতিমধ্যে শ্রীঅরবিন্দ অনেক কিছু আভ্যন্তরীণ সত্যের আবিষ্কার ক'রে ফেলেছেন। প্রথমত, একটা বিষয়ে তিনি নিজের ভুল নিজেই বুঝতে পারলেন। তিনি চেয়েছিলেন যে, উপরের জ্ঞানকে ও শক্তিকে তিনি সকল মানুষের জন্য নিচে নামিয়ে আনবেন, কিন্তু তিনি দেখলেন যে, নিচের দিক থেকে তাদের যদি সেই জ্ঞানকে বা শক্তিকে নেবার মতো গ্রহণযোগ্যতা না থাকে, তাহ'লে শুধু তাঁর একার চেষ্টার ফল কি হবে? অন্ধ বা অন্যমনস্ক ব্যক্তির চলার পথে একটা সোনার তাল এনে রেখে দিলেও তাতে তার কিছু লাভ করিয়ে দেওয়া হয় না, সে ব্যক্তি সেই সোনার তালটিকে এড়িয়ে চলে যায়, সম্যক্ দৃষ্টিশক্তি না থাকায় সে তা হাতে উঠিয়ে নিতে পারে না। যাদের জন্য তিনি ঐ সব অমূল্য সম্পদ নিচে নামিয়ে আনবেন, তাদেরও সেগুলিকে নিতে পারবার মতো তৈরি হওয়া চাই। সে তৈরি হবার উপায় কি? তাদেরও কিছু যোগ সাধনা করতে হবে। তা এমন যোগ হওয়া চাই যাতে সব দিক থেকেই তারা সুপরিণত হয়ে তৈরি হয়ে ওঠে। এর থেকেই আবিষ্কার হ'ল তাঁর পূর্ণ যোগ।

দ্বিতীয়ত, আরো তিনি আবিষ্কার করলেন যে, এ সব ব্যাপারে একজনের দ্বারাই সব কিছু করা সাধ্য হয় না, আরো একজনের সাহায্য দরকার হয়, কাজের ভাগাভাগি দরকার হয়। তিনি করবেন

শক্তিকে আনয়ন, অন্য জন করবেন বিতরণ, এমনি হ'লেই সব চেয়ে ভালো হয়। তখন তিনি দেখতে পেলেন যে, ঠিক এই কাজের জন্যই স্বয়ং মা এসে উপস্থিত হয়েছেন। ভগবানের দিব্য কাজের সুবিধার জন্যই এমন যোগাযোগ ঘটেছে। তিনি দেখলেন যে, ইনি কেবল একজন মানুষী মা নন, ইনি হলেন স্বয়ং জগন্মাতা, ইনি মানুষী দেহের মধ্যে অবতীর্ণা হয়ে এসেছেন এই শক্তি বিতরণের কাজেরই প্রয়োজনে। ভগবানের ক্রিয়া-শক্তির দিকটাকে যখন একটি ব্যক্তি রূপে বোঝাতে হয় তখন তাকে বলা হয়, তিনি জগন্মাতা। শ্রীঅরবিন্দ বললেন সেই শক্তিই এখন মানুষের আকার নিয়ে প্রত্যক্ষরূপে দৃশ্য হয়ে আমাদের মধ্যে নেমে এসেছেন। এ সম্বন্ধে তিনি "The Mother" নামে একখানি সম্পূর্ণ বই-ই লিখে ফেললেন, যার ভাষা ও ভঙ্গী অতুলনীয়। তাতে এই মায়ের সম্বন্ধে সকল কথাই তিনি স্পষ্ট ক'রে বললেন। কিন্তু ভগবানের শক্তির এইভাবে মানুষীরূপে এখানে নেমে আসার কি দরকার পড়েছিল? সে কথা বুঝতে হ'লে আগে ভগবানের সৃষ্টির ক্রমিক বিবর্তনের প্রণালীটা আমাদের বুঝে নেওয়া দরকার।

নিবর্তন ও বিবর্তন

জগতের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞান যে সব তথ্যের আবিষ্কার করেছে, আর আমাদের দেশের আগেকার ঋষিরা তাঁদের যোগের উপলব্ধির দ্বারা যে সব কথা ব'লে গিয়েছেন, দুই মিলিয়ে শ্রীঅরবিন্দ গড়ে তুলেছেন তাঁর বিবর্তন তত্ত্ব। তিনি বলেছেন যে, এই পৃথিবীর সব চেয়ে গোড়াকার ইতিহাস থেকে জানা গেছে, পৃথিবী

তখন একটা জড়পিণ্ড মাত্রই ছিল, এখানে কেবল জল ও স্থল ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কোনো চেতন বস্তুর অস্তিত্বের চিহ্নই তখন নেই। সেই নিশ্চেতন জড়পিণ্ডের উপরে কিন্তু অনেককাল পরে প্রথমে ঈষৎ-চেতনাযুক্ত সজীব সবুজ গাছপালা জন্মাতে দেখা গেল। তারও অনেককাল পরে আবার এখানে আরো বেশি চেতনাযুক্ত নানারূপ জীবদের জন্মাতে দেখা গেল। আবার তারও অনেককাল পরে এখানে তার চেয়েও বেশি চেতনাযুক্ত এবং মন নামক বিশেষ একরকম লক্ষণযুক্ত মানুষ জন্মাতে দেখা গেল। পৃথিবীতে এই যে নতুন নতুন চেতনাসম্পন্ন জিনিসের সৃষ্টি হচ্ছে, এমনি ধাপে ধাপে সৃষ্টির বিকাশ হওয়াকেই বলা হয় ক্রমবিবর্তন, ইংরেজীতে যার নাম Evolution. কিন্তু এখন প্রশ্ন এই, গোড়ার অবস্থার সম্পূর্ণ নিশ্চেতন জড়ের মধ্যে এই চেতনা জিনিসটা হঠাৎ প্রথমে এল কোথা থেকে, যেখানে প্রাণ ব'লে কিছু ছিল না সেখানে প্রাণ এসে পড়ল কেমন ক'রে? শ্রীঅরবিন্দ বলছেন, তা বাইরের কোথাও থেকেই আসেনি, ঐ জড়ের মধ্যেই তা গোড়া থেকে লুকিয়ে ছিল, আর এমন ভাবেই লুকিয়েছিল যে, ধরা যায় না। তিনি বলেন যে, প্রাণহীন জড়বস্তুর মধ্যেও আত্মা থাকে, কিন্তু তা এমন অবস্থাতে থাকে যে, আমরা ধরতে পারি না। ছোট্টো একটা কুঁড়ি দেখে কি কেউ বলতে পারে সেটা কোন ফুলের কুঁড়ি বা কোন রং-এর ফুল তার থেকে ফুটবে? অনেক সময়েই তা বলা যায় না। ভবিষ্যৎ ফুলের রংটা এবং রূপটা তখন কুঁড়ির মধ্যে অতি গোপনে লুকিয়ে থাকে। জড়ের মধ্যেও চেতনা তেমনিভাবে লুকিয়ে থাকে। এই লুকিয়ে থাকাকে তিনি বলেছেন নিবর্তন, ইংরেজীতে involution. বলা বাহুল্য,

সেটা ভগবানেরই চেতনা, সেই নিবর্তনের অবস্থা থেকে ক্রমশ তা খোলস ছাড়িয়ে ধাপে ধাপে বিবর্তিত হয়ে ফুটে উঠছে। তাই মানুষ হবার এক ধাপ আগেই আমরা ছিলাম পূরোদস্তুর জানোয়ার, তার পরে এক ধাপ এগিয়ে আসাতে আমরা এখন হয়েছি মানুষ। কিন্তু তার পরেও কি আর কিছু নেই? এই ধরনের মানুষ হওয়া পর্যন্তই কি আমাদের জীবজন্মের উন্নতি হবার শেষ সীমা? তা হ'তে পারে না, কারণ আমাদের মধ্যে এখনও অনেক অপূর্ণতা রয়েছে, এখনও অনেক জড়তা অজ্ঞানতা রয়েছে, তাতেই আমরা এখনও এত কিছু দুঃখকষ্ট ভোগ করি, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ করতে থাকি,—দেখাই যাচ্ছে যে, আমাদের মধ্যে চেতনার সম্পূর্ণ ফোটা এখনও হয়নি। মন জিনিসটা আমরা পেয়েছি বটে, কিন্তু মনের পরেও ওর চেয়ে উচ্চতর আরো একটা জিনিস আসতে বাকী রয়েছে,—যা ভগবানেরই মূল চেতনার অবস্থা,—শ্রীঅরবিন্দ তার নাম দিয়েছেন অতিমানস, ইংরেজীতে Supermind. সেটি না আসা পর্যন্ত আমরা আধফোটা হয়েই থাকব। কিন্তু পূর্ণভাবে ফোটা তো আমাদের চাই। পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ চেতনা আমাদের আসা চাই, ভগবানের যেমন আছে, তবেই আমাদের ফোটা সম্পূর্ণ হবে।

এখন এখানে একটা কথা এই যে, এ পর্যন্ত যতটা ফোটবার ছিল তা প্রকৃতিই এতকাল একা একা ফুটিয়ে এসেছে, জড়ের তরফ থেকে বা আমাদের নিজেদের তরফ থেকে তাতে কোনো সাহায্য করতে হয়নি,—আর প্রকৃতি তাতে হাজার হাজার বছর সময় নিয়েছে। এই প্রকৃতিটা আবার কে? প্রকৃতি হ'ল ভগবানের শক্তির প্রয়োগ বিভাগের ভাণ্ডারী, জগন্মাতার বিশ্বজগতের বারোমেসে কাজগুলোকে

নিখুঁতভাবে চালিয়ে যাবার দাসী। তাকে কতকগুলো নির্দিষ্ট নিয়ম বেঁধে দেওয়া হয়েছে, সেই নিয়ম মেনেই সে চলতে থাকবে, তার একটু এদিক-ওদিক হবে না। ভগবানের বা জগন্মাতার ইচ্ছার সে বাধ্য। কিন্তু আমাদের মধ্যে মন দেবার সঙ্গে সঙ্গে ভগবান তাঁর নিজের সেই ইচ্ছাশক্তির কিছুটা আমাদের মধ্যেও এখন দিয়ে দিয়েছেন। সেই ইচ্ছাশক্তির জোরে প্রকৃতিকে আমরাও খানিকটা নিজেদের বাধ্য ক'রে নিয়ে কাজ চালাতে পারি। তা তো এখন আধুনিক বিজ্ঞানের দৌলতে নিত্য দেখাই যাচ্ছে। সেই ইচ্ছাশক্তির জোরে প্রকৃতির বিবর্তনের মামুলী নিয়মকেও আমরা তার চেয়ে অনেক বেশি ত্বরান্বিত ক'রে আমাদের নিজেদের চেতনার বিবর্তনকে তাড়াতাড়ি আরো খানিকটা এগিয়ে দিতে পারি। কোন্ উপায়ে তা সম্ভব? সেই উপায়টি হ'ল যোগ। তা ছাড়া, আমাদের পক্ষে এই ত্বরান্বিত বিবর্তনের কাজ আরো সহজ ক'রে দেবার জন্য মা নিজেই এবার আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন। ভগবান এইভাবে মাঝে মাঝে মানুষের বিবর্তনের কাজে সাহায্য করতে স্বয়ং এসে পড়েন, তাকেই আমাদের দেশে বলা হয় 'অবতার'। কেন তা আসেন? সেটাও এবার বুঝতে হবে। এইসব কথা না বুঝলে মাকে জগন্মাতা বলার তাৎপর্যটা ঠিক বোঝা যাবে না।

অবতার রহস্য

আমাদের দেশের শাস্ত্রাদিতে ভগবানের পৃথিবীতে আবতাররূপে অবতীর্ণ হবার কথা আছে, এবং সেটা শুরু হয়েছে জগতে জীব জন্মাবার পর থেকেই। অবতার মানে অনন্ত চেতনাময় ভগবানের

খানিকটা জমাটবাঁধা ঘনীভূত চেতনা, নির্দিষ্ট একটা জীবদেহের মধ্যে এসে তার প্রকাশ পাওয়া। কিন্তু জীবজগতে বিবর্তনক্রিয়ার বিভিন্ন অবস্থাতে কেবল সেই যুগের উপযোগী আকৃতি ও আচরণ নিয়েই অবতারের দেখা পাওয়া যায়, সেইজন্য তাকে বলা হয় যুগাবতার। শাস্ত্রে বলেছে যে, জগতের ধর্মে যখনই গ্লানি আসে, অর্থাৎ কিনা বিবর্তনের ক্রিয়াতে যখনই ভাঁটা পড়ে যায়, প্রকৃতির কর্তব্যকাজে যখন ঢিলে পড়ে যায়, তখনই যুগাবতার এসে তাকে খানিকটা এগিয়ে দিয়ে যান, অর্থাৎ বিবর্তনশীল জীবকে তার নিচের ধাপ থেকে খানিকটা উপরে উঠিয়ে দিয়ে যান। শ্রীঅরবিন্দ এই জিনিসটা খুবই বিশ্বাস করতেন। তিনি বলেছেন, জলময় পৃথিবীতে যখন মাছ জাতীয় জীব ছাড়া আর কোনো জীবই ছিল না, তখন কাজে-কাজেই ভগবান এসেছিলেন মৎস্য অবতার হয়ে। মাছের স্তরের থেকে জীবের আরো একটু উন্নতি হবার পরে তিনি এলেন কূর্ম অবতার হয়ে। তার পরে যখন পৃথিবীতে বুনো জানোয়ারের পালা, তখন এলেন বরাহ অবতার হয়ে। যখন পৃথিবীতে উন্নত জীবের না-জানোয়ার না-মানুষের অবস্থা, তখন এলেন নৃসিংহ (নর ও সিংহের) মিশ্রিত রূপ নিয়ে। যখন তার আরো পরে মানুষরা সবে মানুষের মতো হয়ে এসেছে, তখন এলেন তিনি একটি ছোট্ট মানুষ অর্থাৎ বামন অবতার হয়ে। তার পরে মানুষের চেতনার আরো ক্রমিক উন্নতির স্তর অনুসারে তিনি হলেন রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, চৈতন্য ইত্যাদি। এঁরা সকলেই মানুষের উন্নত যুগের অবতার। এর মধ্যে আবার পূর্ণ-অবতার এবং খণ্ড-অবতারও আছে, সেটা ঐ ঘনীভূত চেতনার মাত্রা অনুসারে। সাধারণ মানুষের চেয়ে একটু বেশি

উঁচুরকমের চেতনা নিয়ে পৃথিবীতে অনেক বড়োদরের মানুষও তো জন্মেছে, তাদের বলা হয় ভগবানের "বিভূতি"। তাদের দ্বারাও জগতের অনেক উন্নতি হয়, এটা আমরা চোখেই দেখতে পাই। যে দেশেই একজন কোনো অসাধারণ মহৎ ব্যক্তি জন্মায় সেই দেশের লোকেরাই তাঁর প্রভাব পেয়ে দ্রুতগতিতে অনেকখানি এগিয়ে যায়। তা যখন হ'তে পারে, তখন একজন পূর্ণ-অবতার এলে তার চেয়ে আরো অনেক বেশি উন্নতির কাজ তো হবেই। বলা বাহুল্য তেমন অবতার যখন আসেন তখন তিনি আপনা থেকেই আসেন, নতুবা চেষ্টা ক'রে কেউ কখনো অবতার হ'তে পারে না।

শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি অবতারই বলেছেন। কিন্তু নিজের সম্বন্ধে বরাবরই এইটুকু মাত্র ব'লে এসেছেন যে, ভগবানের কোনো একটা বিশেষ কাজ করবার তিনি যন্ত্রস্বরূপ হয়ে এসেছেন। কিন্তু মা এসে উপস্থিত হবার পরে এখন তিনি সুস্পষ্ট ভাষাতে বেশ জোর দিয়েই বললেন যে, এই মা হ'লেন স্বয়ং জগন্মাতা, তোমাদের মধ্যে অতিমানসের আলো বিতরণ করতে এবার নিজেই এঁকে আসতে হয়েছে। জগতের এই একটা মহা সন্ধিক্ষণ, মস্ত একটা ওলটপালটের ব্যাপার, সুতরাং এখন মায়ের নিজে আসা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। এখন যদি তোমরা ওঁর সহযোগিতা কর, অতিমানসের জ্ঞান পাবার দিক দিয়ে নিজেরাও যদি খানিকটা চেষ্টা কর, তাহ'লে ওঁর কাজ অনেকটা সহজ হয়ে যাবে। জগন্মাতা সাধারণত চার রকম রূপ নিয়ে চার রকম ভাবে কাজ ক'রে থাকেন। তিনি কখনো বা হ'ন জ্ঞান ও করুণাদায়িনী মহেশ্বরী, কখনো বা শক্তিদায়িনী মহাকালী, কখনো বা সম্পদ ও সৌষ্ঠবদায়িনী মহালক্ষ্মী, কখনো বা শৃঙ্খলা ও

সিদ্ধিদায়িনী মহাসরস্বতী। ইনি সেই চার রকমের শক্তিকে একত্রে নিয়ে পূর্ণস্বরূপেই এখানে হাজির হয়েছেন। এঁকে তোমরা পূর্ণ বিশ্বাসে মেনে নাও, এঁকে তোমাদের অন্তরের মধ্যে কাজ করতে দাও। ইনি ঠিক এখানকার জগতের সমগ্র মানবজাতির উপযোগী হয়ে তেমনি আকার নিয়েই এসেছেন। ইনি কোনো বিশেষ দেশের বিশেষ জাতির মা নন, সারা জগতের সকলের মা ব'লেই তোমরা এঁকে জানবে।

কিন্তু মানো বললেই অমনি চট্ ক'রে মানা যায় না। আমাদের নিজের নিজের মনের মধ্যে রয়েছে কত রকমের সংকীর্ণ বিচারবুদ্ধি, কত রকমের মামুলী সংস্কার। ওরূপ ধরনের কথা আমাদের সাধারণ জ্ঞানের বাইরে, তাই সহজে বিশ্বাস করতে পারি না, অসাধারণ কিছু শুনলেই তার অন্যরকম অর্থ ক'রে বসি। ভারতের গোঁড়া হিন্দু হয়ে এবার নাকি এই একজন ফরাসী নারীকে ওঁর কথায় 'মা' বলতে হবে, পায়ের ধূলো মাথায় তুলে নিতে হবে? কেউ কেউ বললে, অনবরত যোগ ক'রে ক'রে ওঁর এবার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কেউ বা একবার মাত্র পণ্ডিচেরী গিয়ে মাকে চাক্ষুষ দেখে এসে নানারকম টিপ্পনী কাটতে লাগল। যারা শ্রীঅরবিন্দকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে তারাও তাঁর এই কথাটা অর্ধেক বিশ্বাস করলে, অর্ধেক করলে না, কেবল তিনি বলছেন ব'লে তা বাইরে বাইরে কোনোগতিকে মেনে নিলে। এ তো হবেই, কারণ তুমি যত বড়ো করেই ধারণা করতে যাও, জগজ্জননী মা বলতে যে কত-বড়ো একজন মাকে বোঝায়, তা কি সহজে ধারণার মধ্যে আসে? কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ রইলেন তাঁর নিজের কথায় অটল হয়ে। তার পরে অবশ্য ধীরে ধীরে কথাটা

লোকে বুঝতে শুরু করলে। সত্যকে বুঝতে অনেকেরই খানিকটা সময় লাগে। এখন কিন্তু কাজ দেখে এই মাকে সকলেই বিলক্ষণ চিনেছে।

পূর্ণযোগ

এইবারে শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণযোগের সম্বন্ধে বলা যেতে পারে। এই পূর্ণ বা পূর্ণাঙ্গ যোগের সার্থকতা কোথায় সে কথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটা কি তা মোটামুটি এবার বুঝতে হবে। শ্রীঅরবিন্দ নিজে বলেছেন যে, এটা নতুন কিছু নয়, পূর্বে যোগ সাধনার যে তিনরকম রাস্তা ছিল—জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্মযোগ, তার সঙ্গে উপরন্তু শক্তিযোগ মিলিয়ে সমস্তকে এক ক'রে ফেলা হয়েছে। গীতাতেও এমনিভাবে যোগের সমন্বয় করা হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, তুমি জ্ঞানীও হবে, কর্মীও হবে, ভক্তও হবে। শ্রীঅরবিন্দ তার চেয়ে একটু বেশি এগিয়ে বললেন, তুমি শক্তিসাধকও হবে। জ্ঞান, কর্ম, ও ভক্তির সঙ্গে শক্তিও চাই। সাধনা সব দিক দিয়েই একসঙ্গে পূর্ণাঙ্গ হওয়া চাই। যোগ অবশ্য যোগই, এবং নিবিষ্টচিত্তে ধ্যান করাও এতে আছে, কিন্তু এর মধ্যে তা ছাড়াও এমন কতকগুলি বিশেষত্ব আছে যা ইতিপূর্বে কোনো যোগেই ছিল না। সেগুলি কি কি তাই এখন দেখা যাক—

(১) প্রথমত, একে পূর্ণ যোগ বলা হয়েছে এইজন্য যে, এর দ্বারা সাধকের মধ্যে একটা পূর্ণাঙ্গ বা সর্বাঙ্গীণ পরিণতি আসবে। আগেকার লোকে কেবল মনের দিকটা ধরেই যোগ করত, তারা বলত যে, দেহটা অতি বাজে জিনিস, মনকে আশ্রয় দেবার খাঁচা বৈ তো নয়; ও যেমন আছে তেমনি থাক। দেহের মধ্যে প্রাণের

অবস্থাও যেমন আছে তেমনি থাক। তুমি কেবল মনকে নিয়ে কাজ ক'রে যাও। এতে দেখা যেত যে, মনের তাতে খুবই উন্নতি হ'ত বটে, এমন কি ভগবানের চেতনার নাগাল পেয়ে তারা তার সঙ্গেও হয়তো মিলে যেত, কিন্তু তাদের তাতে দেহ কিংবা প্রাণের দিকের কিছুই বদলাতো না। তাই দেখা যেত যে, কেউ একজন মহাযোগী হয়েছেন, কিন্তু তবুও তিনি অন্য দিক দিয়ে মহারাগী কিংবা মহাভোগী কিংবা মহালোভী রয়ে গেছেন। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন যে, এমন হ'লে চলবে না। দেহ কিংবা প্রাণ কোনোটাই তুচ্ছ ব্যাপার নয়, পৃথিবীর কোনো কিছুই অনর্থক জিনিস নয়, কারণ সবই এসেছে ভগবান থেকে। তাই পূর্ণাঙ্গ যোগে কেবল মনকে ধরেই সাধনা করা চলবে না, সব কিছু ধরেই এবং সব কিছু নিয়েই সাধনা করতে হবে। গোড়া থেকে এই লক্ষ্য নিয়েই কাজ শুরু করতে হবে যাতে আমার ভিতর বাহির সব কিছুই আগাগোড়া বদ্‌লে যায়, দেহ পর্যন্ত সকল অংশই দিব্যভাবে পরিবর্তিত হয়ে ওঠে। শ্রীঅরবিন্দ একে বলেছেন transformation, অর্থাৎ আমূল রূপান্তর। এই আমূল রূপান্তর চাইবার সাধনাই আমাদের করতে হবে। এমন রূপান্তর হওয়া চাই যাতে আমাদের জড়ের মধ্যেও চেতনা জাগে। এমন রূপান্তরের কথা শ্রীঅরবিন্দ ছাড়া আর কেউ ইতিপূর্বে বলেননি।

(২) সবাই এ যোগের পথে চলতে পারে, কারো পক্ষেই বাধা নেই। এর জন্য ঘর ছেড়ে বনে যাবার দরকার নেই, কাজ ছেড়ে ঘরে খিল আঁটবারও দরকার নেই। লেখাপড়া করা, সংসারধর্ম করা প্রভৃতি কোনো কিছুতেই আটকাবে না। যোগ করা মানে এখানে

সন্ন্যাসী হওয়া নয়। অতএব এর সঙ্গে খেলাধূলা, সাহিত্য বা সঙ্গীত বা বিজ্ঞানের চর্চা, দেহ চর্চা, এবং যার যা ব্যবসা কিংবা বাণিজ্য কিংবা পেশা, সব কিছুই এর সঙ্গে চলতে পারবে। বাহ্যিক ব্যবস্থা কোনো কিছুই বদলাতে হবে না, বদলাতে হবে কেবল ভিতরকার অবস্থা। আমূল বদলাবার সেই সাধনাটি সব কিছু কাজের মধ্য দিয়েই ভিতরে ভিতরে চলতে থাকবে।

(৩) এই যোগের প্রণালীগুলি কেমন? প্রথমত, এর জন্য দরকার মন থেকে কতকগুলি জিনিসকে প্রত্যাখ্যান করতে শেখা। কামনা, লোভ, রাগ, ভয়, হিংসা, অহংকার প্রভৃতি জিনিসগুলি আমাদের মনের মধ্যে ঢুকে নিত্য নানারূপ বিকৃত মনোভাবের সৃষ্টি করে, আর তাতেই আমরা বেশির ভাগ সময় ডুবে থাকি। কাজেই আমাদের ভাবনার মধ্যে শ্রদ্ধা, ভক্তি কিংবা কোনো উচ্চভাব স্থায়ী রকমের জায়গা পায় না। সুতরাং ওগুলিকে নিত্যই প্রত্যাখ্যান ক'রে দিতে হবে, অর্থাৎ নিত্য হুঁশিয়ার থেকে যেমনি দেখবে যে, ঐ সব চিন্তা মনের মধ্যে এসে গেছে কিংবা হয়তো আসছে, অমনি তৎক্ষণাৎ তাকে হাঁকিয়ে দিতে হবে। এরই নাম প্রত্যাখ্যান, শ্রীঅরবিন্দ একে বলেছেন rejection। এই প্রত্যাখ্যানের কাজটি ক্রমশ মনের দ্বারা অভ্যাস ক'রে নিতে হবে। ওর মধ্যে সব চেয়ে পাজি জিনিস হ'ল অহংকার—আমি এই হয়েছি, আমি এই করেছি, আমার এত ক্ষমতা, আমার এত রয়েছে, আমার চেয়ে ওরা সকলে এত ছোটো, ইত্যাদি সব কিছু কথাই অহংকার। অথচ ওর সমস্তই মিথ্যা কথা, কারণ তোমার নিজের মুরদে কিছুই হয়নি। কিন্তু সেই মিথ্যার দ্বারা চোখের সামনে সে তোমার নিজের সম্বন্ধে এমন একটি

অতিরঞ্জিত ফটোগ্রাফ তুলে ধরবে যে, তোমার সত্যিকার চেহারাটি তুমি ভুলে গিয়ে মনে করবে, বাহবা রে, কি চমৎকার আমি! এই অহংকারকে তাড়াতে হ'লে, যতবারই একে ঢুকতে দেখবে ততবারই (মায়ের ভাষাতে) এর নাকের উপর থাপ্পড় কষিয়ে দেবে, তাহ'লেই শেষ পর্যন্ত এর চালাকি থেমে যাবে। এই অহংকারটি না গেলে ভগবানে আত্মসমর্পণ করা হয় না।

যেমন অহংকার, তেমনি রাগ প্রভৃতিও আমাদের নিজেদের ভিতরের কিছু নয়, সবই বাইরের থেকে এসে ফাঁক পেলেই আমাদের মধ্যে ঢুকে পড়ে। শ্রীঅরবিন্দ বলেন যে, রোগও যেমন বাইরের থেকে এসে আমাদের আক্রমণ করে, রাগ জিনিসটাও ঠিক সেই ভাবেই আসে। একটু সূক্ষ্মবোধ থাকলেই আগের থেকে জানতে পারা যায় যে, এবার আমার মধ্যে রাগ আসছে, আর ভিতরে মোটে তাকে ঢুকতে না দিয়ে বাহির থেকেই তাড়িয়ে দেওয়া যায়। এইটি ক্রমশ অভ্যাস করতে হবে। শুধু রাগ নয়, সব রকমেরই অবাঞ্ছিত ও অশুভ মনোভাবকে এইভাবে নিত্য প্রত্যাখ্যান করতে হবে। এইরকম করতে থাকলে তখন ওগুলি আর না এসে মনের মধ্যে একটা শান্ত ও দিব্য মনোভাব স্থায়ী হবে।

দ্বিতীয় কথা, এক রকমের মনোবিশ্লেষণ। ভিতরের দিকে লক্ষ্য রাখলেই আমরা দেখতে পাই যে, আমাদের প্রত্যেকেরই মনের মধ্যে দু'জন আলাদা আলাদা মানুষ রয়েছে—তার মাঝে একজন সব কিছু কাজ করতে থাকে, আর অন্যজন তার সেই সব কাজ-করা চুপচাপ কেবল দেখে যেতে থাকে। আমাদের দেশের শাস্ত্রে ঐসব করার মানুষটিকে বলা হয় 'প্রকৃতি', আর সাক্ষীস্বরূপ দেখার মানুষটিকে

বলা হয় 'পুরুষ'। এই দু'জনকে আমাদের আলাদা ক'রে ফেলতে হবে, অর্থাৎ বাইরের মানুষটি বাইরের কাজ নিয়ে থাকুক, কিন্তু ভিতরের মানুষটি তার দোষগুলো ধরবে। বাইরের মানুষটি কাজে যতই ব্যস্ত থাক, কিন্তু ভিতরের মানুষটি ঠিক অবিচল থাকবে। এই ভাবে চলতে থাকলে ক্রমে ভিতরের মানুষটিই হয়ে উঠবে প্রধান, তখন সে বাইরের মানুষটিকে এমন বদ্‌লে ফেলবে যে, তারই দ্বারা পরিচালিত হয়ে সেও নির্ভুল কাজ করতে থাকবে। তখন সব কাজই ভগবানে সমর্পিত হ'তে পারবে।

(৪) তার পরে, মনের মধ্যে নিত্যই একটা আস্পৃহা, একটা আকূতি, একটা আকিঞ্চন জাগিয়ে রাখতে হবে, যাকে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন aspiration। সে কিসের আকিঞ্চন? আমার মধ্যে এখনও ঘুমিয়ে রয়েছে যে উচ্চতর ও গভীরতর চেতনা তা এবার জেগে উঠুক, চেতনারূপী ভগবান আমার মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ হোন, এই আকিঞ্চন। কিন্তু সে কি আমার নিজের চেষ্টায় কখনো হ'তে পারে? তা নয়, ভগবানের কৃপা এসে পড়লেই সেটি আপনা থেকে হয়ে যাবে, যাকে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন Divine Grace। অতএব এই কৃপা পাবার জন্যই আমাকে সর্বক্ষণ আকিঞ্চন করতে হবে। ভগবানের কৃপা রয়েছে সকলের জন্যই, কিন্তু তাকে আমার হৃদয়ের মধ্যে পাওয়া চাই, তাকে পাওয়ার জন্য নিজের হৃদয়কে প্রস্তুত করা চাই। আহারে-বিহারে-নিদ্রায়-জাগরণে সব সময় অকৃত্রিমভাবে আকিঞ্চন করতে থাকলেই ক্রমে ক্রমে সেই প্রস্তুতি এসে যায়। শাস্ত্রে বলে, যার যেমন ভাবনা সে তেমনি সিদ্ধি পায়, এ কথাটা মিথ্যা নয়।

(৫) কৃপা পেতে হ'লে, অর্থাৎ সাধনাকে সার্থক করতে হ'লে আরো দু'টি জিনিস থাকা বিশেষ দরকার। তার মধ্যে একটি হ'ল বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা, শ্রীঅরবিন্দ তাকে বলেছেন faith। বিশ্বাস মানে ভগবান বা আল্লা আছেন এইটুকু মাত্র বিশ্বাস নয়। তিনি যে নিষ্ক্রিয়-নির্বিকার কিংবা বোবা-কালা ভগবান নন, আমাদেরই মধ্যে তিনি সচল সক্রিয় ও সচেতন হয়ে আছেন, সব কথাই তিনি জানছেন, শুনছেন, প্রত্যেকের প্রতিই তাঁর নজর আছে, কারো আন্তরিক আকিঞ্চনকে কখনই তিনি ফেরান না, ঐকান্তিকতা (sincerity) থাকলে তাঁর কৃপা এবং তাঁর সর্বোচ্চ চেতনা একদিন আমিও পেতে পারি, এই দৃঢ় বিশ্বাস। এমন ধরনের বিশ্বাস সহজে আসে না, বিশেষত আজকালকার দিনে। মহাপুরুষদের কথা শুনে, সাধু ও সাধকদের দৃষ্টান্ত দেখে তখনকার মতো একটা বিশ্বাস হয়তো জন্মায় ; তা ছাড়া, সুখে থাকলে তখন ভগবানকে বিশ্বাস তো হয়েই থাকে, কিন্তু দুঃখে-কষ্টে পড়লেই আবার অবিশ্বাস এসে যায়। কিন্তু তেমন হ'লে চলবে না। বিশ্বাসকে জোর ক'রে আঁকড়ে ধরা দরকার, সেখানে ক্লিষ্ট-মনের বিকৃত তর্কবুদ্ধির আবিল বন্যায় ভেসে গেলে চলবে না। বুদ্ধির বিচারের চেয়ে বিশ্বাসের স্থান অনেক উঁচুতে। জীবনের সকল রকম অবস্থাতেই সেই বিশ্বাসটিকে ধরে রাখতে হবে।

(৬) বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে আরো একটি জিনিস থাকা দরকার,—একান্ত নির্ভরতা ও আত্মসমর্পণ, যাকে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন surrender। এই একান্ত আত্মসমর্পণই পূর্ণ যোগের সবচেয়ে বড়ো কথা, আর এটাই সবচেয়ে কঠিন কাজ। নিজের সব কিছু দখলবোধকে একেবারে ঘুচিয়ে দিয়ে অন্য কারো হাতে নিজেকে সর্বান্তঃকরণে

সঁপে দিতে হবে। কেবল মুখে বললেই হবে না, কিন্তু মনের ভিতরের অতি গোপনীয় দখলবোধটাও আর তখন থাকবে না,—এ-ভাবটি সহজে আনা যায় না। প্রতি পদে অহংকার এসে বাধা দেয়। তার পরে আরো একটা সমস্যা রয়েছে, কার হাতে নিজেকে এমন একান্তভাবে সঁপে দেবো? ভগবান ব'লে তো কাউকে আপাতত দেখা যাচ্ছে না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, মায়ের হাতে সব কিছু সঁপে দাও, তাঁর অমোঘ শক্তির কাজগুলো তো অন্তত জগতের মধ্যে দেখা যাচ্ছে, সেই শক্তিই হলেন মা কালী। তাঁর কাছে 'বেড়াল-ছানার মতো' আকুল হয়ে শুধুই তাঁকে ডাকতে থাক, তাহ'লে তিনি তোমাকে নিজেই তুলে যেখানে নেবার নিয়ে যাবেন। শ্রীঅরবিন্দ বলছেন, মা যখন মানুষী হয়ে দেখা দিয়েছেন, তখন আর তো কোনো ভাবনা নেই, এঁর হাতেই সব ছেড়ে দাও। আর কিছু তোমাদের করতে হবে না, নিজের হৃদয়কে বন্ধ না রেখে এঁর কাছে উন্মুক্ত ক'রে মেলে দাও (opening), এঁকে তোমার অন্তরের মাঝে ঢুকে কাজ করতে দাও, তাহ'লে ইনিই তোমাদের মধ্যে এনে দেবেন দিব্য চেতনা ও রূপান্তর। ইনি তোমাদের সকল কথাই জানতে পারেন, সকল শক্তিই দিতে পারেন, এঁর উপর নির্ভর যদি কর তবে হাজার দোষত্রুটি থাকলেও ইনি তোমাদের স্নেহ করবেন, ক্ষমা করবেন, রক্ষা করবেন। শ্রীঅরবিন্দ বললেন, আমি সকল রকম রাস্তা পরীক্ষা ক'রেই শেষকালে এই চরম রাস্তার কথা বলছি, এই আত্ম-সমর্পণের মতো সোজা রাস্তা আর নেই। একে তিনি বলেছেন sunlit path, অর্থাৎ আলোয় আলোয় চলে যাবার রাস্তা। এ রাস্তায় চলতে শুরু করলে তোমাদের কোনো অচেনা পথের অন্ধকারে

আর হাতড়ে বেড়াতে হবে না। মায়ের উপর একান্ত নির্ভরতা এনে নিশ্চিন্ত হয়ে আর নিশ্চিত পরিণতির প্রত্যাশা নিয়ে এই যোগের পথে চলতে থাক, ফল একদিন তার মিলবেই। সে ফল যে কেবল জ্ঞানলাভ ও শক্তিলাভ তা নয়, তাতে হবে এক অফুরন্ত আনন্দলাভ। তার কারণ দিব্য চেতনার দিব্য আনন্দই হ'ল একটা বিশেষ গুণ। চেতনাপুষ্পের সমস্ত পাপড়িগুলি যখন খুলে যাবে তখন শান্তি, মুক্তি, মীমাংসা, আলো, আনন্দ, সব কিছুই আপনা হ'তে এসে পড়বে।

পূর্ণ যোগের মধ্যে আরো অনেক কথা আছে, কিন্তু মোটের উপর দেখা যাচ্ছে যে, সবই ভিতরকার ব্যাপার। মন নামক যন্ত্রটি হাতে পেয়ে যেমন আমাদের অনেক সুবিধাও হয়েছে, তেমনি তার ভিতরে অনেক দোষও এসে গেছে। মনের চাতুরীকে আমরা ছাড়তে চাই না, তার সাহায্যে কেবলই নিজেদের তরফের সকল বিষয়ে সুবিধা ক'রে নিতে ব্যস্ত থাকি। এই কারণেই মনের চেয়ে আর বেশি উপরে আমরা উঠতে পারি না, আমাদের দুঃখ-কষ্ট কিছুই ঘোচে না। মনের চাতুরীগুলোকে প্রত্যাখ্যান ক'রে যদি আমরা তারও উপরে উঠবার আস্পৃহা নিয়ে থাকি, আর শ্রদ্ধা ও নির্ভরতার সঙ্গে যদি মায়ের হাতে বা ভগবানের হাতে সব কিছুর ভার দিয়ে দিই, তাহ'লে তাঁর কৃপার জোরেই তাঁর উচ্চতর চেতনাতে গিয়ে একদিন আমরা উত্তীর্ণ হ'তে পারব। এই উপায়ের কথাটি শ্রীঅরবিন্দ নতুন ক'রে ও বিশেষ ক'রে ব'লে দিয়েছেন। এ কোনো আন্দাজের বলা কথা নয়; রীতিমত বৈজ্ঞানিক সত্যের মতোই এ-একটা পরীক্ষালব্ধ সত্য। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর যোগকে রীতিমত সায়ান্সের পর্যায়ে এনে ফেলেছেন। একে বলা যেতে পারে উচ্চ-আধ্যাত্মিক মনোবিজ্ঞান।

শ্রীঅরবিন্দের নীরব যুগ

মা এসে আশ্রম পরিচালনার সমস্ত ভার নিয়ে নেবার কিছুকাল পর থেকে, এবং "আর্য" পত্রিকা লেখা বন্ধ ক'রে দেবার পর থেকে শ্রীঅরবিন্দের বাহ্যিক আচরণের কিছু পরিবর্তন দেখা গেল। পূর্ণ যোগ সম্বন্ধে কিছু কিছু আভাষ দিলেও ঐ সকল কথা তখনও তিনি খুব ভালোভাবে প্রকাশ করেননি। তার কারণ তখন নিজেই এই তত্ত্বটিকে আরো সম্পূর্ণভাবে পরীক্ষা ক'রে তিনি দেখে নিতে চাইছেন, তা ছাড়া, উচ্চতর কোনো চেতনাকে আমাদের নাগালের মধ্যে নামিয়ে আনতে চাইছেন। তখন ইউরোপে প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে, কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আসন্ন, জগতের সকল মানুষ অতিশয় বিপন্ন, তাই জগতের মঙ্গলের জন্য আধ্যাত্মিকের স্তরে তাঁকে অনেক বেশি পরিশ্রম করতে হচ্ছে। তাই তিনি অতঃপর বাইরের লোকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করা ও কথাবার্তা বলা আরো কমিয়ে দিলেন। তখন এই ব্যবস্থা হ'ল যে, মা ছাড়া এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয় আরো দুই একজন ছাড়া অন্য কেউ তাঁর কাছে যাবে না। যার যা কিছু বলবার কিংবা জিজ্ঞাসা করবার দরকার হবে তা মায়ের মারফতে জানতে হবে, মা নিজে গিয়ে তাঁকে বলে উত্তরটা তাঁর কাছ থেকে এনে দেবেন। এমন কি, ভক্তদের বেলাতেও এই ব্যবস্থা। তিনি তখন নির্জনে একলা থাকতে চান। এটা অবশ্য অনেকের ভালো লাগেনি, তাই এই নিয়ে কেউ কেউ নানারকম অভিযোগ করেছে, এমন কি, কেউ কেউ তাঁর নামে নিন্দাও রটিয়েছে। ভাবনগরের নারাণদাস নামক এক ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইলে তিনি সাক্ষাৎ করেননি। সেই লোকটি এতে অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে মহর্ষি রমণের

কাছে গিয়ে তাঁর নামে নানারকম কুৎসা করে। কিন্তু তখন তিনি খুব একটা সূক্ষ্ম স্তরে কাজ করতে উঠে পড়ে লেগেছেন, সেখানে চূড়ান্ত মনঃসংযোগের একটু কিছু ব্যতিক্রম ঘটলেই তাঁর সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। নতুবা ভিড়ের মধ্যে বসেও যোগ করতে যিনি অভ্যস্ত ছিলেন, তিনি এমন ব্যবস্থা করবেন কেন? কিন্তু তখন আরো বেশি সূক্ষ্ম রকমের কাজ তাঁকে করতে হচ্ছে, তাই নির্জনতায় থাকা নিতান্তই প্রয়োজন। কয়েকজনকে খুশি করতে গিয়ে তিনি সকলের মঙ্গলের কাজকে অবহেলা করতে পারেন না। তিনি বলেছিলেন, লোকের সঙ্গে বৃথা আলোচনা করতে গেলে তাতে বিষের মতো ফল হ'তে পারে, করতলগত চরম সত্য হাতের কাছ থেকে সরে যেতে পারে, তাই এমনি ব্যবস্থাই কয়েক বছর যাবৎ চলতে থাকল। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটতে দেখা গেল না।

সিদ্ধি দিবস

১৯২৬ সালে শ্রীঅরবিন্দ চুয়ান্ন বছর বয়সে পা দিলেন। ঐ বছর তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে ১৫ই আগষ্ট তারিখে তিনি ভক্তদের কাছে এই একটি অর্থপূর্ণ কথা বললেন যে, আমাদের যোগের উদ্দেশ্য হচ্ছে, উপস্থিত মানব চেতনার চেয়ে আরো এক বৃহত্তর চেতনাকে আমাদের মধ্যে নামিয়ে আনা; সে চেতনার এমনই শক্তি যে, তা আমাদের মনের ও প্রাণের ও দেহেরও বর্তমান অবস্থাকে একেবারেই বদ্‌লে দেবে। তিনি আরো বললেন, আগের যোগে যতটা পর্যন্ত পৌঁছনো যেত, এই যোগের পক্ষে তা যাত্রাপথের প্রথম ঘাঁটি মাত্র, সেই ঘাঁটি পার হয়ে এই যোগ আরো অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবে।

সেদিনের পর থেকে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসা আরো কমিয়ে দিলেন। এমন কি, বিকেলে চায়ের টেবিলে পর্যন্ত এসে আর বসতেন না, সর্বদা নিজের ঘরেই একা একা সর্বক্ষণ থাকতেন। এইভাবে আরো তিন মাস কাটল।

২৪শে নভেম্বর তারিখে মা হঠাৎ আশ্রমের সবাইকে এক জরুরী খবর দিলেন যে আজ সন্ধ্যার সময় তোমরা উপরে যাবে, শ্রীঅরবিন্দ তোমাদের সকলকে ডেকেছেন। প্রবল ঔৎসুক্য নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে সবাই সেখানে গিয়ে জড়ো হ'ল। সেখানে শ্রীঅরবিন্দের বসবার জন্য একটি চেয়ার পাতা হয়েছে, তার পিছনে এক রেশমের পর্দা টাঙানো, তাতে আঁকা রয়েছে জরির কাজ করা তিনটি ড্রাগন। চীন দেশের প্রচলিত রীতি অনুসারে তিনটি ড্রাগন একত্রে থাকলেই তাতে সিদ্ধিলাভের নির্দেশ ব'লে বুঝতে হয়।

শ্রীঅরবিন্দ ধীরে ধীরে এসে সেই চেয়ারটিতে বসলেন। মা বসলেন তাঁর পাশেই রাখা একটা ছোটো টুলের উপর। শ্রীঅরবিন্দের মুখে-চোখে তখন একটা সুগভীর ও স্নিগ্ধ প্রশান্তি। সবাই নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইল, কেউ কোনো কথা বললে না। অতঃপর মায়ের নির্দেশে সকলে মিলে ধ্যান করতে থাকল প্রায় ৪৫ মিনিট পর্যন্ত। সকলেই তখন স্পষ্ট অনুভব করেছিল যে, তারা কোনো আনন্দের স্বর্গলোকে রয়েছে। ধ্যান ভাঙবার সঙ্গে সঙ্গে সেই স্বপ্নটা তাদের ভেঙে গেল। নিঃশব্দে প্রত্যেকেই শ্রীঅরবিন্দের কাছে উঠে গেল। নিঃশব্দে তিনি একে একে তাদের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। সবাই বুঝলেন যে, একটা নতুন কিছু সাফল্য মিলেছে।

ঐ দিনটি তার পর থেকে শ্রীঅরবিন্দের সিদ্ধি দিবস ব'লে

প্রসিদ্ধ। সিদ্ধিলাভ হওয়ার কথাটা শুনলেই আমরা মনে করি সিদ্ধ ব্যক্তির নিজের বিশেষ কিছু লাভ হওয়া, নিজে কিছু শক্তি বা সম্পদ পাওয়া। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ নিজের জন্য কখনই কিছু পেতে চাননি, যদিও নিজের তরফের একরূপ সিদ্ধিলাভ তাঁর অনেক কাল আগেই হয়ে গেছে। কিন্তু তিনি সকলের জন্য যা নামিয়ে আনতে চেয়েছিলেন, যে সম্বন্ধে তিনি ইতিপূর্বে নিজের জন্মদিনেই কিছু ইঙ্গিত করেছিলেন, এখানে বুঝতে হবে সেই বিষয়েই তাঁর সিদ্ধিলাভ হ'ল। পরে তিনি এ সম্বন্ধে বলেছিলেন যে, সর্বোচ্চ অতিমানস চেতনাটি এখনও যদিও আমাদের আয়ত্তের মধ্যে নেমে আসেনি বটে, কিন্তু ঐ দিন থেকে বিশেষ একটি উচ্চতর চেতনা এখানে অবতরণ করেছে। সেটি হ'ল শ্রীকৃষ্ণের চেতনা। যে চেতনা নিয়ে পাঁচ হাজার বছর আগে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ জগতে এসেছিলেন, শ্রীঅরবিন্দ তাকেই এতকাল পরে আবার নামিয়ে আনলেন, এখন তিনি হলেন সেই চেতনারই উত্তরাধিকারী। এখন থেকে সেই চেতনা আমাদের জগতে কাজ করবে, আর এই হ'ল অতিমানসের চেতনা নেমে আসবার পূর্বসূচনা। এখন থেকে তারই জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে, আর জগৎকে ক্রমশ তারই আনন্দের দিকে অগ্রসর ক'রে দেবে। শ্রীকৃষ্ণের চেতনা মানে তা নিত্য আনন্দময়ের চেতনা। শ্রীকৃষ্ণকে তাই বলা হয় চির-আনন্দময়।

সিদ্ধির পরে কি কি পরিবর্তন ঘটল

সেই দিনের পর থেকেই শ্রীঅরবিন্দ তাঁর থাকবার ঘরটি বদলালেন। আগেকার ঘর ছেড়ে দিয়ে তখন থেকে তিনি আশ্রমের উত্তর-পূর্ব কোণে একটি অন্য ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। তার পর

সেই ঘরটিতেই তিনি তাঁর জীবনের বাকী পঁচিশ বছর কাটিয়েছেন, আর একবারও ঘর বদলাননি। আর এর পর থেকে তিনি সম্পূর্ণ-ভাবেই লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকতে শুরু করলেন। মা এবং আরো দু'একজন ছাড়া অন্য কেউ তাঁর সাক্ষাৎ পেত না। বছরের মধ্যে কেবল চারটি দিন মাত্র তিনি সকলকে দর্শন দিতেন। তার মধ্যে একটি হ'ল তাঁর জন্মদিন ১৫ই আগষ্ট, একটি হ'ল মায়ের দ্বিতীয়বার পণ্ডিচেরীতে এসে পৌঁছবার দিন ২৪শে এপ্রিল, একটি হ'ল শ্রীঅরবিন্দের সিদ্ধির দিন ২৪শে নভেম্বর, আর একটি হ'ল মায়ের জন্মদিন ২১শে ফেব্রুয়ারি। এই চারটি দর্শনের দিন ছাড়া অন্য দিন কেউ তাঁকে দেখতে পেত না।

আশ্রমের অবস্থা সম্বন্ধেও যথেষ্ট পরিবর্তন হ'তে দেখা গেল। ভক্ত ও শিষ্যদের সংখ্যা হঠাৎ অনেক বেশি বেড়ে গেল, কাজেই আশ্রমের জন্য আরো অনেকগুলি বাড়ি সংগ্রহ করতে হ'ল। আশ্রমের আদর্শ ও কার্যপ্রণালী আরো বেশি সুনির্দিষ্ট হয়ে উঠল। শ্রীঅরবিন্দ-আশ্রম তখন হয়ে দাঁড়াল যেন পূর্ণ যোগ সম্বন্ধে পরীক্ষা ও গবেষণা করবার এক ল্যাবরেটরি। আধ্যাত্মিক শক্তির ব্যাপার নিয়েই সেখানকার যা কিছু গবেষণা। মায়ের নির্দেশ অনুসারেই তখন সকলের সব কিছু গবেষণা পরিচালিত হচ্ছে। বহু লোক সেখানে বাস করছে অথচ কোনো সাড়াশব্দ বা কোলাহল নেই, সর্বদাই আশ্রমটিকে ঘিরে এক অনির্বচনীয় শান্তি বিরাজ করছে।

আশ্রম বেড়ে যেতেই তার খরচপত্রও অনেক বেড়ে গেল। কিন্তু তখন সেখানে আর্থিক অবস্থা অনেক বেশি সচ্ছল হয়েছে। মা নিজেও ছিলেন ধনী, তা ছাড়া চারিদিক থেকে প্রচুর অর্থাগম হ'তে

থাকলো। পৃথিবীকে আমরা যতই খারাপ ব'লে মনে করি না কেন, তবু এখানে এখনকার কালেও মহৎ কাজের বেলাতে অর্থের কোনো অভাব হয় না। অন্ততপক্ষে এটা দেখা গেছে যে, শ্রীঅরবিন্দের সম্পর্কিত কোনো কাজেব বেলাতেই কখনো অর্থের অভাব হয়নি।

পঁচিশ বছর পরেও এই আশ্রমটি উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। এখন সেখানে প্রতি মাসে লক্ষ টাকারও বেশি খরচ হয়। ওকে এখন আত্মনির্ভরশীল আলাদা একটি ছোটো শহর বলা যেতে পারে। সেখানকার জীবনধারণের জন্য যা কিছু দৈনন্দিন প্রয়োজন তার অধিকাংশ জিনিস সেখানেই উৎপন্ন করা হয়, বাইরের জিনিস খুব কমই আসে। এখানে সকল রকম কাজেরই আলাদা আলাদা বিভাগ আছে—কৃষি বিভাগ থেকে, কুটীর শিল্প বিভাগ থেকে, পোলট্রি ডেয়ারি ও ছাপাখানা থেকে, জুতা প্রস্তুত ও পোশাক তৈরির বিভাগ পর্যন্ত। আশ্রমের লোকেরাই সেই সব বিভাগের ভার নিয়ে কাজ করে। সকলকেই বাঁধা নিয়ম অনুযায়ী খাটতে হয়, কেউই বিনা কাজে বেকার বসে থাকে না। জ্ঞানী ও সাধক ব্যক্তিরাও কিছু-না-কিছু হাতের পরিশ্রমের কাজ নিয়ে থাকেন। আর মা নিজে প্রত্যেককেই তাদের সকল রকম কাজের নির্দেশ দিয়ে থাকেন। সবাই কাজ করছে মায়েরই আদেশ নিয়ে, এবং তারা মায়েরই কাজ করছে। এ আশ্রমটিকে সন্ন্যাসীদের আশ্রম মনে করলে ভুল হবে, কারণ সন্ন্যাসীর মতো হয়ে কেউই এখানে নেই, সকলেই নিতান্ত সাধারণ মানুষের মতো। তবে একে কর্মযোগের আশ্রম বলা যেতে পারে, সকলেরই যোগ সাধনা চলেছে কর্মের ভিতর দিয়ে। উপস্থিত সেখানে প্রায় দেড় হাজার লোক একত্রে

বাস করছে। সম্প্রতি মা সেখানে দুই হাজার শ্রমিকদেরও থাকবার ব্যবস্থা করবেন ব'লে এক পরিকল্পনা করেছেন। এ ছাড়া, সম্প্রতি পণ্ডিচেরীর উত্তরে করমণ্ডল উপকূলে এক বিরাট ভূখণ্ড কিনে সেখানে শ্রীঅরবিন্দের নামে 'অরোভিল' নামক এক বিরাট আন্তর্জাতিক শহর গড়ে তোলারও পরিকল্পনা তিনি করেছেন, যেখানে জগতের সকল দেশের লোকই এসে নিরুপদ্রবে বাস করতে পারবে। যে আশ্রম প্রথমে মাত্র দশ-বারজনকে নিয়ে শুরু হয়েছিল, তা এখন ক্রমে ক্রমে কত বিরাট হয়ে উঠছে তা সহজেই অনুমেয়।

রবীন্দ্রনাথের উক্তি

সিদ্ধির কিছুকাল পরে ১৯২৮ সালে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং একবার পণ্ডিচেরীতে যান ও শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই সম্বন্ধে তিনি তখন লিখেছিলেন—

"অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে দেখা হয়েছে। প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝলুম, ইনি আত্মাকেই সব চেয়ে সত্য ক'রে চেয়েছেন, সত্য ক'রে পেয়েওছেন। সেই তাঁর দীর্ঘ তপস্যার চাওয়া ও পাওয়ার দ্বারা তাঁর সত্তা ওতপ্রোত। আমার মন বললে: ইনি এঁর অন্তরের আলো দিয়েই বাহিরে আলো জ্বালবেন।···তাই তাঁর মুখশ্রীতে এমন সৌন্দর্যময় শান্তির উজ্জ্বল আভা।···আমি তাঁকে ব'লে এলুম, আত্মার বাণী বহন ক'রে আপনি আমাদের মধ্যে বেরিয়ে আসবেন এই অপেক্ষায় থাকব। সেই বাণীতে ভারতের নিমন্ত্রণ বাজবে: শৃণ্বন্তু বিশ্বে।···

"অরবিন্দকে তাঁর যৌবনের মুখে ক্ষুব্ধ আন্দোলনের মধ্যে যে তপস্যার আসনে দেখেছিলুম সেখানে তাঁকে জানিয়েছি—অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার। আজ তাঁকে দেখলুম তাঁর দ্বিতীয় তপস্যার আসনে অপ্রগল্‌ভ স্তব্ধতায়, আজও তাঁকে মনে মনে ব'লে এলুম—অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।"

রূপান্তর

রবীন্দ্রনাথ যে শ্রীঅরবিন্দের মুখশ্রীতে "সৌন্দর্যময় শান্তির উজ্জ্বল আভার" কথা বলেছিলেন, তা বর্ণে বর্ণে সত্য। যারাই ঐ সময়ে দর্শনের দিনগুলিতে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দকে স্বচক্ষে দেখে এসেছে, তারাই অতি বিস্ময়ের সঙ্গে তাঁর আশ্চর্য রূপান্তর সম্বন্ধে নানারূপ বর্ণনা দিয়েছে। তারা প্রত্যেকেই বলেছে তাঁর চেহারার এবং মুখশ্রীর অসাধারণ সৌন্দর্যের কথা বাক্যের দ্বারা বোঝানো যায় না। তারা বলেছে যে, তিনি আজকাল প্রায় সব রকম খাওয়াই ছেড়ে দিয়েছেন। যা খাবার তাঁকে দেওয়া হয় তার থেকে দুই চার চামচ মাত্র মুখে তুলেই তিনি খাওয়া ছেড়ে দেন, তবু এতেই তিনি আগের চেয়ে অনেকখানি পুষ্ট ও পরিবর্তিত হয়েছেন। "আর্য" পত্রিকা লেখার সময়ের ছবিতে দেখা যেত যে তিনি পূর্বেকার চেয়ে অনেকখানি রোগা, কিন্তু এখন আর সেই রোগা চেহারা একেবারেই নেই। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, তাঁর গায়ের রংটাই গেছে একেবারে বদ্‌লে। আগেকার গায়ের রং ছিল রীতিমত শ্যামবর্ণ, এখন তাই হয়ে দাঁড়িয়েছে উজ্জ্বল গোলাপী গৌরবর্ণ, তার থেকে যেন একটা হিরণ্যজ্যোতি ঠিক্‌রে বেরোচ্ছে। তা ছাড়া শ্রীঅরবিন্দের চোখে এক অপূর্ব আলোর অঞ্জন মাখানো, মুখের স্মিতহাসিতে এক অপূর্ব করুণা ছড়ানো, দৃষ্টিতে এক অপূর্ব আশীর্বাণীর মৌন মুখরতা। সবাই বলেছে, তাঁর দেহ থেকে যে জ্যোতি বেরুচ্ছে তা গল্পে শোনা দিব্যদেহ ছাড়া মানুষের দেহে কখনো সম্ভব হয় না।

এই কথায় আমাদের মনে হয় যে, জগতে শ্রীঅরবিন্দের মতো এত বড়ো অ্যাড্‌ভেঞ্চার আর কেউ কখনো করেনি। আমরা মঙ্গল গ্রহে

যাবার অ্যাড্‌ভেঞ্চারের গল্প পড়ি, চাঁদে ওঠবার কথাও অনেক শুনে থাকি, কিন্তু এ তার চেয়েও বেশি। এ যে একেবারে ভগবানের কাছ পর্যন্ত ধাওয়া করা। শ্রীঅরবিন্দ প্রথম চাইলেন কেবল দেশের লোকের মুক্তি। তার পরে চাইলেন সারা জগতের লোকের মুক্তি। শুধু নিজে চাইলেই হয় না দেখে তিনি কঠোর তপস্যায় বসলেন, অনেক কষ্ট সহ্য ক'রে, অনেক দুর্গম সাধনার ভূমি পার হয়ে তিনি আবিষ্কার করলেন পূর্ণ যোগের রাস্তা। আবার সেই রাস্তায় নিয়ে গিয়ে তিনি সকলকে তাঁর অ্যাড্‌ভেঞ্চারের ভাগ দিতে চান। শুধু তাতেই হ'ল না, জগতে সমুচিত শক্তি বিতরণ করবার জন্য তিনি স্বয়ং জগন্মাতাকে পর্যন্ত এখানে নামিয়ে এনে সেই দুরূহ কাজের ভারটি তাঁকে দিলেন। আবার তাতেও হ'ল না, সিদ্ধির পথে উঠে গিয়ে তিনি শ্রীকৃষ্ণের চেতনাকেও এখানে নামালেন, যাতে জগতের লোকের আরো বেশি সুবিধা হয়। শেষকালে সবাই চর্মচক্ষেই দেখলে যে, রূপান্তর পাবার কথাটা তিনি আজগুবি বলেননি, তাঁর নিজের শরীরেই তা এসে গেছে, সেই রূপান্তরের জ্যোতি তাঁর সারা অঙ্গে ঝল্‌মল্‌ করছে।

এর থেকে আমাদের মনে পড়ে যায় প্রাচীন যুগের বিশ্বামিত্র ঋষির কথা। ব্রহ্মতেজের জোরে চাইলেন তিনি নতুন রকমের এক ভুবন সৃষ্টি করতে। কিন্তু তাঁর সেই সংকল্প তখন সফল হয়নি। এখন তিনিই কি আবার ফিরে এসেছেন তাঁর সেই ব্যর্থ সংকল্পকে সফল ক'রে তুলতে? অন্তত দু'জনের লক্ষ্য যে একই রকমের, এটা স্পষ্টই দেখা যায়। তিনি বাস্তবে যা আনতে পারেননি, ইনি এবার তাই প্রায় এনে ফেলেছেন।

তবু আরো সাধনা চলল

কিন্তু তবুও শ্রীঅরবিন্দের তপস্যার কাজের শেষ হ'ল না। সিদ্ধির পরে সবাই মনে করেছিলেন যে, এর পর থেকে আর কোনো নির্জন প্রয়াসের বুঝি প্রয়োজন হবে না। এবার হয়তো তিনি একটু নিশ্চিন্তে থাকবেন, সকলের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে আবার মিশবেন, ভক্তদের সঙ্গে অন্তত আগের মতো আলাপ-আলোচনা করবেন। কিন্তু সকলকে বিস্মিত ক'রে তিনি ভক্তদের কাছে ঘোষণা করলেন—"আমার সাধনার এখনও শেষ হয়নি। উচ্চতম সত্যকে নামিয়ে আনবার জন্য আমাকে আরো বেশি গভীরে ডুবতে হবে। তোমাদের সকল বিষয়ের সব কিছুর ভার রইল একান্তভাবে মায়েরই উপরে। যতদিন পর্যন্ত আমার এই সাধনার সমাপ্তি না হয় ততদিন পর্যন্ত আমাকে সম্পূর্ণ নির্জনেই থাকতে হবে।" এর পরে আর কোনো কথা নেই।

গ্রন্থ রচনা

তার পর থেকে পঁচিশটি বছর তিনি যে সর্বক্ষণ সাধনাতেই ব্যাপৃত থাকতেন তা অবশ্য নয়। উচ্চতর চেতনায় অধিষ্ঠিত থেকে তিনি প্রচুর গ্রন্থ, প্রবন্ধাদিও লিখতেন। ঐ সময়ের মধ্যেই তাঁর মহামূল্য সব গ্রন্থগুলি একে একে রচিত হ'তে থাকে। সাধনার ক্ষেত্রে তাঁর যা কিছু জ্ঞানসঞ্চয় হচ্ছিল সেগুলিকে তিনি লিপিবদ্ধ ক'রে রাখছিলেন জগতের মানুষদের জন্য। পূর্বে "আর্য" পত্রিকাতে তিনি অনেক বিষয়ের সূত্রপাত করেছিলেন, কিন্তু সেগুলির অধিকাংশই তিনি সম্পূর্ণ করতে পারেননি, এখন সেগুলিকে একে

একে গ্রন্থাকারে সম্পূর্ণ করতে থাকলেন। সবই তাঁর নিজস্ব মৌলিক অনুভূতির ফল। তার মধ্যে অনেক নতুন নতুন ভাব ও মৌলিক তত্ত্ব, কিন্তু সমস্তই বর্তমান জগতের মানুষদের বুদ্ধিগ্রাহ্য সুযুক্তিতে পরিপূর্ণ। এগুলি লিখতে যে তাঁকে অনেক কঠোর পরিশ্রম ক'রে যেতে হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই, কারণ সেই সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে অবলীলাক্রমে লেখা যায় না। আমাদের দেশের অনেককেই বলতে শুনি যে, শ্রীঅরবিন্দের বইগুলি পড়া এবং তার অর্থ বোঝা অত্যন্ত দুরূহ। তা তো হ'তেই পারে, ইংরেজ দার্শনিকদের লেখা গ্রন্থগুলিও আমাদের কাছে খুব সুবোধ্য নয়। অনেকে বলেন, আমাদের দেশের আধ্যাত্মিক তত্ত্বসকল ইংরেজী ভাষাতে চালান করতে গিয়েই লেখা অমন দুর্বোধ্য হয়েছে। কিন্তু তা আমাদেরই কাছে, ইংরেজী-জানা কৃতবিদ্য পাশ্চাত্ত্য দেশের লোকদের কাছে নয়। আমাদের দেশের সনাতন ধর্ম ও সনাতন দর্শনকে সারা জগতে প্রচার ক'রে দেওয়াই ছিল অভিপ্রেত। তাই শ্রীঅরবিন্দের সব কিছু অবদান ইংরেজীতে লেখা হবে, এটাও ছিল অভিপ্রেত। তাঁর পিতা যে তাঁকে ছেলেবেলা থেকেই বিলাতে কেবল ইংরেজী লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন, তাও ছিল অভিপ্রেত। আমাদের যা জানবার তা আমরা এখানে সরাসরি জানতে পারি, কিন্তু সারা জগতের লোককে তাঁর ইংরেজী লেখার ভিতর দিয়েই তা জানাতে হবে। নতুবা উপায় কি? 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে' ব'লে সারা জগতের লোককে আমন্ত্রণ ক'রে শোনাতে হ'লে তখন জগতের এই সর্বজনীন ভাষাটাই ব্যবহার করা দরকার। এ কথা আমাদের বোঝা উচিত।

শ্রীঅরবিন্দের লিখিত ছোটো-বড়ো অনেক বই আছে।

বিস্তারিতভাবে সকল লেখার নামোল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। তার মধ্যে "দিব্য জীবন" ("The Life Divine") সর্ববৃহৎ ও সর্বশ্রেষ্ঠ। ওর মধ্যে শ্রীঅরবিন্দের নিজের আবিষ্কৃত তত্ত্বগুলি সবই সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যাত করা আছে। জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে তাঁর যা বক্তব্য সবই তিনি ওতে লিখে গেছেন। এই সুবৃহৎ বইখানি ঘনসন্নিবদ্ধভাবে ছাপা হয়ে প্রায় ১০০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। এর সম্বন্ধে কিছু না বললে তাঁর জীবনান্ত পরিশ্রমের আসল কথাটাই বাদ দেওয়া হয়। তবে তার সকল কথা এখানে বলতে পারা আদৌ সম্ভব নয়। আমরা তার মূল ভাবটুকু নিয়ে মোটামুটিভাবে কিছু বলতে চেষ্টা করব।

'দিব্য জীবন' কাকে বলে ?

শ্রীঅরবিন্দ কাকে বলেছেন দিব্য জীবন? মানুষ যে জীবনে এক দিব্য ধরনের বৃহত্তর চেতনা পাবে, যে জীবনে মানবজাতি সুখে-স্বচ্ছন্দে সুন্দর ও সহজভাবে আনন্দের দিন যাপন করবে, মানুষের পক্ষে এখনকার চেয়ে সেই উচ্চস্তরের জীবনই হবে দিব্য জীবন। সে জীবনের যুগে সকলেই যে উচ্চস্তরে উঠে যাবে, সকলেই যে দিব্যত্ব লাভ করবে, তা অবশ্য নয়। কিন্তু অনেকেরই সেই সৌভাগ্য হ'তে পারবে, আর বাকী সকলে তাদেরই প্রভাবের ও আবহাওয়ার মধ্যে থাকার দরুন স্বাভাবিক সুখশান্তি হ'তে বঞ্চিত হবে না। এমন শান্তিময় দিব্য জীবনের ধারণা মানুষ অনেক আগের থেকেই পেয়েছে, এবং কেউ কেউ আপন সাধনার জোরে সেই দিব্য জীবনের উচ্চস্তরে নিজেরা উঠে যেতেও হয়তো পেরেছে, কিন্তু তথাপি তা সেই দুই একজন মাত্র, অনেকে নয়। তাতে আমাদের মামুলী জগতের

অবস্থা কিছুই বদলায়নি। কিন্তু মনুষ্য জগতের এখন যা অবস্থা হয়েছে তা সম্পূর্ণই বদ্‌লে যাওয়া দরকার। আমরা বুদ্ধিমান মানুষ, অনেকেই এর পরিবর্তন চাইছি, তবু কেন এখনকার এই অবাঞ্ছিত অবস্থাটা কিছুতে বদলাচ্ছে না? বুদ্ধি থাকলেও কেন আমরা বুঝছি না যে, পরস্পরে স্বার্থপরতা ও যুদ্ধ লড়ালড়ি ক'রে আমাদের অনিষ্টই হচ্ছে? সুখ পেয়েও আমরা সুখী নই কেন? কেউ খাদ্যাভাবে অসুখী, কেউ খাদ্য থাকলেও অসুখী, এমন কেন? সবরকম সুখের উপায় আবিষ্কার ক'রেও আমাদের দুঃখ ঘোচে না কেন? কিন্তু দিব্য জীবন পেলে আমাদের এমন অবস্থা থাকবে না।

অতিমানস

আসল কথা এই যে, বুদ্ধিমান মানুষ হ'লেও আমরা এখনও অপরিণত, আমাদের জ্ঞান এখনও অপূণ। সবটা ফুটে ওঠা আমাদের হয়নি, আজ পর্যন্ত কেবল আমাদের বুদ্ধির পাপড়িগুলোই খুলেছে। কিন্তু বুদ্ধি হ'ল একরকম একচোখো খণ্ড-চেতনা, কেবল নিজের দিকটা আর নিজের ঘরের দিকটার কথাই বড়জোর সে ভাবতে পারে, পরকে মেরে নিজেকে বাঁচাবার জন্য আণবিক ও দানবিক অস্ত্রাদিও আবিষ্কার করতে পারে, কিন্তু তার বেশি আর পারে না। তাই বুদ্ধির চেয়েও আমাদের আরো উপরে উঠতে হবে। এর চেয়েও একটা উপরের স্তর রয়েছে। নিচেকার পাপড়িগুলো ফুটে গেলেও তার উপরের স্তরের পাপড়িগুলো এখনো বোজানো রয়েছে, সেগুলিকে এবার ফোটাতে হবে, মাত্র দুই একজনের মধ্যে নয়, কিন্তু অনেকের মধ্যে। তাকেই বলা হয় বুদ্ধির উপরকার "বিজ্ঞানের" স্তর।

সায়ান্স্‌কে এখন আমরা চলিত কথায় বিজ্ঞান বলি, কিন্তু প্রাচীনেরা চেতনার সেই উচ্চ স্তরকেই বলতেন বিজ্ঞানের স্তর। "বিজ্ঞান" মানে বিশেষ রকমের জ্ঞান, যাতে হিসেবী বুদ্ধির যুক্তি-বিচারের কোনো দরকার হয় না, সহজ বোধির ভিতর দিয়ে সে জ্ঞান আপনা থেকেই আসে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলতে পারা যায় শ্রীরামকৃষ্ণের কথা, এই সহজ বোধির দ্বারাই তিনি কোনো পার্থিব বিদ্যা না শিখেও সকল রকম জটিল প্রশ্নের কত সহজ ও সুন্দর মীমাংসা ক'রে দিতেন। এই বিজ্ঞান কেমন জিনিস সে সম্বন্ধে আমরা সাধারণ মানুষে এখনও কোনো ধারণাই করতে পারি না। তা তো পারবই না, কারণ সে জিনিস এখনও আমাদের মধ্যে এসে পোঁছয়নি। যখন আসবে তখন জানা যাবে, তার আগে কেমন ক'রে জানব? পৃথিবীতে যখন কেবল জড়েরই রাজ্য ছিল তখন কি ধারণা করা যেত যে, প্রাণ কেমন বস্তু, আর এই জড়ের রাজ্যের মধ্যে তা কোনোদিন আসবে? আবার যখন পৃথিবীতে কেবল জানোয়ারেরই রাজ্য, তখনও কি ধারণা করা যেত যে, মন আর বুদ্ধি কেমন জিনিস, আর সেই মনসম্পন্ন মানুষরা হঠাৎ জানোয়ারদের চেয়ে বড়ো হয়ে গজিয়ে উঠবে? এক একটা যুগ যখন পৃথিবীতে চলতে থাকে, তখন তার পরের যুগ সম্বন্ধে আগের থেকে কিছু জানাই যায় না। যেখানে গোড়ায় ছিল জড়ের যুগ, সেখানে তার পরে এল প্রাণের যুগ, তার পরে এখন মন ও বুদ্ধির যুগ,—এমনি ভাবেই বিবর্তনের ক্রমবিকাশ ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছে। এখন বুদ্ধির চরম সীমান্তে আমরা পৌঁছে গেছি, এর পরে আসছে সেই বিজ্ঞানের পালা। অতিমানস বা Supermind হ'ল সেই বিজ্ঞানের উপরকার জিনিস,

যার কথা শ্রীঅরবিন্দই প্রথম বুঝিয়ে বলেছেন। এই অতিমানস কথাটির মানে ভগবানের মহামন, যে মন নিয়ে তিনি তাঁর কাজ করেন। আমরা কাজ করি আমাদের সাধারণ মনের দ্বারা, তিনি কাজ করেন তাঁর অতিমানসের দ্বারা। সেই অতিমানসের আলো আমাদের মধ্যে যখন নেমে আসবে তখনই আমরা দিব্য জীবন লাভ করব, আর তখনই বুঝতে পারব যে, সংকীর্ণ মনের বুদ্ধিটাকে নিয়ে আমরা এতকাল কি ছেলেমো কাণ্ডই করছিলাম। তখন জানতে পারব যে, আমার তোমার ব'লে কিছু নেই, আসলে সমস্ত কিছুই হ'ল একজনের। আমরাও প্রত্যেকেই সেই একজনের থেকেই এসেছি, সেই একজনের ইচ্ছাই পালন ক'রে যাচ্ছি, তারই কাজকে নিজেদের ব্যক্তিগত কাজ আর তারই শক্তিকে নিজেদের ব্যক্তিগত শক্তি ব'লে মনে করছি। এ কেবল চেষ্টা ক'রে বুঝতে পারার কথা হচ্ছে না, আপনা থেকে বোধ আসার কথা। এই জ্ঞানটি যখন সব সময় মনে গাঁথা থাকবে আর এই জ্ঞান অনুসারেই আমরা চলব, তখন সেই হবে দিব্য জীবনের যুগ। আমাদের শাস্ত্রাদিতে জগতের সেই অবস্থাকেই বলেছে সত্য যুগ, যীশু খ্রীষ্ট বলেছিলেন স্বর্গরাজ্য, মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন রামরাজ্য, ইত্যাদি। তার যে নামই দেওয়া হোক তাতে কিছু যায় আসে না।

অবতরণ ও আরোহণ

শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন যে, সেই অতিমানস চেতনার অবতরণ আর তার দ্বারা আমাদের মধ্যে দিব্য জীবনের স্ফুরণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী, সে অবস্থা আমাদের জগতের একদিন হবেই। কিন্তু কোনো একটা

ক্রিয়া দুইতরফ থেকে হ'লে তা যেমন সহজে সম্পন্ন হ'তে পারে, একতরফা হ'লে তেমন নয়। ভগবানের নিজের কথাগুলি শুনতে হ'লে আগে তোমার তরফ থেকেও তাঁর দিকে কান বাড়িয়ে দেওয়া চাই, নইলে যতই তিনি চেতনার বাণী ঢালতে থাকুন, কিছুই তোমার মগজের মধ্যে ঢুকবে না। উচ্চতর কোনো চেতনা যে এখনও অবতরণ করতে পারছে না, তার কারণ আমরা আমাদের বুদ্ধির দ্বারা মোটা মোটা খোলসের গণ্ডী রচনা ক'রে তারই মধ্যে নিজেদের আগ্‌লে রেখেছি, বুদ্ধি ছাড়া কোনো কিছুকেই মগজের মধ্যে ঢুকতে দিতে চাই না, সুতরাং সে খোলস ভাঙতে প্রকৃতির পক্ষে আরো অনেক হাজার বছর লেগে যেতে পারে। কিন্তু সে কাজ অনেকটাই এগিয়ে যাবে যদি আমরা আমাদের নিজেদের তরফ থেকেও সেই খোলস ভাঙতে প্রয়াস করি। সবাই একসঙ্গে তা করবে না, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে অনেকেই তা করতে পারে, যার খুশি সেই করতে পারে। সেই প্রয়াসই হ'ল এই যোগ, যার কথা পুর্বে বলা হয়েছে। তাই শ্রীঅরবিন্দ যোগের উপর এত বেশি জোর দিয়েছেন। আমাদের তরফের এই চেষ্টাকে তিনি বলেছেন ascent বা উপরে আরোহণের চেষ্টা। আমিও যদি উচ্চ চেতনার মধ্যে আরোহণ করতে চেষ্টা করি, আর সেই উচ্চ চেতনাও যদি আমার মধ্যে অবতরণ করতে চেষ্টা করে, তাহ'লে কাজটা খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। উপরের চেষ্টা আগের থেকেই রয়েছে, উচ্চতর চেতনা আমাদের মাথার উপরেই প্রতীক্ষা করছে, এখন আমাদের তরফের আরোহণ চেষ্টাটিও দরকার।

এই আরোহণের ফল কি? এতে তাড়াতাড়ি ভগবানের নাগাল

পাওয়া যায়, তাতে বিবর্তনের শেষ ধাপে গিয়ে পৌঁছনো যায়। নইলে বহু জন্মের বহু বিলম্ব লাগে। শ্রীঅরবিন্দ জন্মান্তর বিশ্বাস করতেন। তিনি বলতেন যে, একটা জীবনের কয়েকটা বছরের মধ্যে কতদূরই বা এগোনো যায়? কাজেই বিবর্তনের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে আমাদের বারে বারে পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয়। মানুষ সবাই সমান নয়, তার কারণ বিবর্তনের পথে কেউ বা খানিকটা এগিয়ে আছে, কেউ বা পিছিয়ে আছে। কিন্তু তারা অর্থাৎ তাদের আত্মা যোগ সাধনার দ্বারা তাড়াতাড়ি অনেকটা এগিয়ে যেতে পারে, দশটা জন্মের কাজ একটা জন্মের মধ্যেই সেরে ফেলতে পারে। এই যোগের আরোহণের দ্বারা যতটা উন্নতি হ'তে পারে এমন আর কিছুতে নয়। যোগই আমাদের পক্ষে আরোহণের সর্বোৎকৃষ্ট ও শীঘ্রতম পন্থা।

শ্রীঅরবিন্দের "দিব্য জীবন" সম্বন্ধে আমরা এখানে প্রাথমিক কয়েকটি কথা মাত্রই বলতে পারলাম। কিন্তু ওর মধ্যে আরো বহু রকমের বহু তত্ত্ব রয়েছে। এ যে তাঁর একটা কাল্পনিক থিওরি মাত্র নয়, তার অনেক যুক্তি ও প্রমাণ তিনি বিশদভাবেই দেখিয়েছেন।

দিব্য জগতের নমুনা

শ্রীঅরবিন্দের "দিব্য জীবন" যে শুধুই একটা মানসিক আদর্শ নয়, এ জগতে তেমন ধরনের জীবন এনে ফেলা যে বাস্তবরূপেই সাধ্য এবং সম্ভব, তার প্রত্যক্ষ নমুনা মা দেখিয়ে দিয়েছেন পণ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে। সেখানে দেড় হাজার মানুষ এখন একত্রে বাস করছে। তারা সকলেই যে পূর্ণযোগে সিদ্ধ হয়ে গেছে এমন

কথা মোটেই নয়। মা নিজে বলেছেন, এরা সকলে নাবালক শিশু মাত্র, তিনি শিশুর মতোই তাদের সঙ্গে ব্যবহার করেন। কিন্তু তাদের মধ্যে নিত্য প্রভাব বিস্তার করছে মায়ের নিজের অতিমানস চেতনা, তাতেই যথেষ্ট কাজ হয়েছে। তারা আমাদেরই মতো সাধারণ মানুষ, কিন্তু তাদের জীবনযাপন, তাদের আচার-আচরণ, তাদের মনোভাব ঠিক আমাদের মতো নেই। আমাদের জগতে প্রত্যেকেরই বিষদাঁত আছে, কিন্তু তাদের কোনো 'বিষদাঁত' নেই। কোনো একটা অপূর্ব মিষ্টতার আস্বাদ পেয়ে তারা দংশন করবার স্বভাবটাই যেন ছেড়ে দিয়েছে। এমন হবার কারণও রয়েছে। মনের দিক থেকে সন্ধান নিলে দেখা যায় যে, তারা জেনেছে কোনো কিছুই তাদের নিজেদের জিনিস নয়, সবই মায়ের জিনিস,—কোনো কাজই নিজেদের নয়, সবই মায়ের কাজ। সুতরাং সর্বক্ষণ নিজেদের জিনিস আগলে থাকার দিকে, কিংবা ফাঁকি দিয়ে পয়সা উপার্জনের দিকে, কিংবা অর্থসঞ্চয়ের দিকে কোনো লক্ষ্যই তাদের নেই, তার কোনো প্রয়োজনই নেই। কাজ প্রত্যেকের স্বতন্ত্র হ'লেও সকলের লক্ষ্য কিন্তু একটি মাত্র, মায়ের কাজটিকে সুসম্পন্ন করা,—কারো কাজের উদ্দেশ্য জীবিকা-অর্জন নয়, সকলেরই উদ্দেশ্য মায়ের কাজ ক'রে আত্মতৃপ্তি ও আত্মোপলব্ধি অর্জন। এখানেই তো অনেক কিছুর তফাৎ হয়ে গেল। প্রাণের দিক দিয়ে সন্ধান নিলে দেখা যায় যে, তাদের মধ্যে আমাদের মতো দোষ-ত্রুটি যে কিছু নেই তা নয়, কিন্তু মস্ত কথা এই যে, সেখানে ছোটো-বড়োর ভেদবিচার নেই, প্রতিযোগিতা আছে কিন্তু রেষারেষি নেই, হিংসাবিদ্বেষ নেই। আর খাওয়া পরা বা সংসার প্রতিপালনেরও কোনো ভাবনা নেই,

তারা নিশ্চিন্ত হয়ে জানছে যে মা-ই তার যা কিছু ব্যবস্থা করছেন ও করবেন। সুতরাং সব দিক দিয়েই তারা একান্ত মাতৃনির্ভর। এখানে দেখি, আমাদের জীবনে কোনো কিছুর উপরেই নির্ভরতা নেই, কিন্তু তাদের অন্তত একজনের উপরে সম্পূর্ণ নির্ভরতা, এমন কি নিজেদের দেহের দিক দিয়েও। অসুখ বিসুখ হ'লেও তারা ব্যস্ত হয়ে ওষুধ খেতে যায় না, মায়ের উপরেই নির্ভর ক'রে থাকে, তিনি যা ওষুধ খেতে বলেন তাই খায়, তিনি যা করতে বলেন তাই করে। এই নির্ভরতাই তাদের নিরুদ্বিগ্ন ক'রে রাখে। তাদের রোগপীড়াও খুব কমই হয়, কারণ সুনিয়মিত জীবনে তাদের কোনো অন্যায় অত্যাচার নেই, কোনোরূপ নেশাভাঙ করা নেই, সকলেই পরিশ্রম ও ব্যায়াম করে, তাতে শরীর বরাবরই সুস্থ থাকে, আর মা নিত্যই সতর্কদৃষ্টি দিয়ে আছেন যাতে আশ্রমের মধ্যে কারো কোনো অমঙ্গল না হয়। কাজেই মনে-প্রাণে ও দেহে সকল দিক দিয়েই সেখানে মায়ের উপর অকুণ্ঠ নির্ভরতা। কেউ কেউ হয়তো বলবেন যে, এতটা পরনির্ভরতা ভালো নয়, এতে মানুষকে অমানুষ করে, তার আত্ম-বিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা নষ্ট করে। কিন্তু আমাদের আত্মমর্যাদা মানেই নিজেকে বড়ো ক'রে দেখা, তখন 'আমি'টাই সব জুড়ে বসে, ভগবানের সেখানে স্থান নেই। মা বলেন নির্ভরতা ও আত্মসমর্পণের নম্রতাতেই ভগবানের কৃপা মেলে, দিব্য চেতনার জ্যোতি তখন অবাধে আমাদের ভিতরে প্রবেশ করতে পারে। শ্রীঅরবিন্দও তাই নির্ভরতার উপরে খুব বেশি জোর দিয়ে বলেছেন যে, মানুষকে নিশ্চিন্ত ক'রে দেবার জন্য এর মতো উপায় আর কিছু নেই। ভগবানের উপর নির্ভরতাই হবে দিব্য জীবনের একটা প্রধান লক্ষণ। ভালো মন্দ কোনো

অবস্থাতেই এ নির্ভরতা ঘুচবে না। বৃহত্তর জগতেও ঐ আশ্রমীদের মতোই তখন মনে হবে, রক্ষাকর্তা তো আছেন ভাবনা কি।

সহজ রকমের দিব্য জীবনের এই দৃষ্টান্ত। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন ভগবানের উপর এমনি নির্ভরতা আনতে হবে, আমাদের স্বার্থবুদ্ধির প্রশ্রয় পেয়ে যে সব বিকৃত বৃত্তিগুলি মনের মধ্যে এসে উঁকি মারে সেগুলিকে বর্জন কিংবা প্রত্যাখ্যান করতে হবে, কাজকর্ম সকল রকমই করতে থাকবে, কিন্তু যত সব বাজে ভাবনাকে আসতে না দিয়ে মনটিকে সর্বদাই খুলে রাখবে ভগবানের দিকে, মনে মনে ভগবানের কৃপা পাবার একটা নিশ্চিত প্রত্যাশা নিয়ে থাকবে, দুঃখকষ্ট কিংবা বিপদ-আপদ যাই আসুক কিছুতে হাল ছাড়বে না, হতাশা কিংবা অবিশ্বাস কিংবা সন্দেহকে কিছুতে আমল দেবে না। এই ধরনের আস্পৃহা ও সাধনা নিয়ে থাকলে একদিন ভিতরকার দরজা খুলে যাবে, অজ্ঞানতার পর্দা সরে যাবে, কৃপার কাজ শুরু হয়ে যাবে, আর নতুন রকমের চেতনা পেয়ে দিব্য জীবনও তোমার শুরু হয়ে যাবে। বাইরে তুমি যেমন আছ তেমনিই থাকবে, কিন্তু ভিতরে হয়ে যাবে মন-বদলে-যাওয়া অন্য রকমের মানুষ। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে যারা রয়েছে, কেবল তারাই যে এই পন্থা ধরে চলছে তা নয়, যারা বাইরের লোক অনেক দূরদূরান্ত থেকে মাঝে মাঝে আশ্রমে যাতায়াত করে এবং এই পন্থাই অনুসরণ করে, তাদের মধ্যেও ঐ ধরনের নির্ভরতা ও পরিবর্তন এর মধ্যেই অনেকটা যেন এসে গেছে।

"যোগ বিশ্লেষণ"

"দিব্য জীবন" ছাড়া অন্যান্য অনেক বই-এর মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ আরো একখানি বিশিষ্ট বই লিখেছেন, তার মূল ইংরেজী নাম "Synthesis of Yoga"। অনেকের মতে এই বইখানি তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। "আর্য" পত্রিকাতে এর কতক অংশ প্রকাশিত হয়েছিল, বাকীটা লেখা হয় মৃত্যুর কয়েক বছর পূর্বে। বইখানি যোগ সম্বন্ধেই বিশদভাবে লেখা, কিন্তু সে বই সম্পূর্ণ হয়নি, তার প্রথম ভাগটি মাত্রই প্রকাশিত হয়েছে। এর গোড়াতেই এই কথা বলা হয়েছে যে, সার্থকভাবে যোগ করতে হ'লে চারটি জিনিস দরকার। তার মধ্যে প্রথমটি হ'ল শাস্ত্র, অর্থাৎ আধ্যাত্মিক বিষয়ের গ্রন্থাদি পড়ে তার থেকে জ্ঞানসঞ্চয়। দ্বিতীয়টি হ'ল উৎসাহ, সে উৎসাহ কিছুতে শিথিল হ'লে চলবে না। তৃতীয়টি হ'ল গুরু, অর্থাৎ প্রতি পদে তোমাকে সাহায্য ও নির্দেশ দেবার মতো আর যথোচিত শক্তি দেবার মতো কোনো উপদেষ্টা। কিন্তু এ তিনটি থাকা সত্ত্বেও আরো যা দরকার তার নাম কাল, অর্থাৎ সময়ের সাহায্য, তার মানে যার পক্ষে যতদিন সময় লাগে ততদিন পর্যন্ত তাকে ধৈর্য ধরে সাধনা করতে হবে, উপযুক্ত সময় না এলে সাধনার ফল পাওয়া যাবে না। সুতরাং এই চারটি জিনিসকে অবলম্বন ক'রে নিয়ে যোগের পথে অগ্রসর হওয়া উচিত।

"শ্রীঅরবিন্দের চিঠি"

সিদ্ধির পর থেকে শ্রীঅরবিন্দ কারো সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ কিংবা কথাবার্তা না করলেও তার কিছুকাল পর থেকে সকলকে তিনি

রীতিমতভাবে চিঠি লিখতে শুরু করেন। জিজ্ঞাসু ব্যক্তি সকলকেই তিনি চিঠি দিতেন, তারা দূরেই থাক কিংবা নিকটেই থাক, এমন কি আশ্রমেরই ভক্তেরা প্রত্যহ তাঁকে চিঠি লিখে কিছু জানতে চাইলে প্রত্যহই তিনি তার জবাব দিতেন। কাজেই ক্রমশ চিঠির সংখ্যা অত্যন্ত বেশি বেড়ে যায়, ঐ নিয়েই তাঁকে প্রত্যহ অনেকখানি পর্যন্ত সময় ব্যয় করতে থাকতে হয়। প্রথমে পাঁচ ছয় ঘণ্টা থেকে পরে আট দশ ঘণ্টা পর্যন্ত সময় তাঁকে এই সব চিঠি লেখাতেই নিযুক্ত হয়ে থাকতে হ'ত। দিনে তাঁর অন্য রকমের কাজ থাকত, চিঠিগুলি লিখতেন তিনি রাত্রে। এই লিখতে লিখতে মধ্যরাত্রি পার হয়ে যেত, কোনো কোনো দিন সারা রাত্রিটাই কাবার হয়ে যেত, ভোরের আলো দেখা দিলে তখন তাঁর চিঠি লেখা শেষ হ'ত। চিঠি বললেই আমাদের মনে হবে তা বুঝি দুই এক লাইন বা দুই এক পৃষ্ঠা লেখা, কিন্তু তা ঠিক নয়, অধিকাংশ চিঠিকেই এক একটা সুবৃহৎ প্রবন্ধ বলা যেতে পারে। বলা বাহুল্য এই সব চিঠি যখন তিনি লিখতেন তখন সর্বক্ষণই থাকতেন তাঁর উচ্চ জ্ঞান ও উচ্চ চেতনার রাজ্যে, সেখান থেকেই তিনি সকলের কথার জবাব দিতেন। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, সেই উচ্চস্তর থেকে লিখলেও তার ভাষাটি আদৌ গুরুগম্ভীর নয়, একেবারে সরল ও স্বচ্ছ, মাঝে মাঝে বেশ কৌতুকপূর্ণ। কোনো প্রশ্ন দেখে যখন তাঁর মজা লাগত তখন মজার ভাষাতেই তিনি তার জবাব দিতেন। কোনো ভক্ত তাঁকে প্রশ্ন করেছিল যে, এই সব সামান্য চিঠি লিখে তিনি তাঁর অমূল্য সময় নষ্ট করছেন কেন? তিনি তার জবাবে লেখেন যে, কোনো জিনিসটাই "সামান্য" নয়, বিধাতা যখন একটি ধূলিকণা গড়েন তখন তাঁর অনন্ত সৃষ্টির মধ্যে সেটিরও

এক বিশেষ মূল্য থাকে। অর্থাৎ তিনি জানতেন যে, তাঁর এই সব চিঠির কতখানি কি মূল্য আছে। তিনি জানতেন যে, ভগবান কোনো বিশেষ কারণে তাঁকে দিয়ে এই সব চিঠি লেখাচ্ছেন, আর তিনি তাঁরই যন্ত্রস্বরূপ হয়ে তা লিখে যাচ্ছেন। তাতেই তাঁর এ কাজে অনেক পরিশ্রমেও ক্লান্তি ছিল না, তাতেই তাঁর এই "সামান্য" কাজেও ছিল অপার আনন্দ।

এখন আমরা সেই সব চিঠি পড়ে বুঝতে পারছি, তা কত অসামান্য। সে চিঠি ব্যক্তিগতভাবে কোনো একজনকে মাত্র লেখা নয়, আমাদের সকলের ও প্রত্যেকের উদ্দেশেই লেখা। সকল কালের সকল মানুষই তার থেকে নিজেদের ভিতরকার অনেক জটিল প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবে। তাঁর দিব্য জীবনের ও তাঁর পূর্ণ যোগের সকল কথাই এর মধ্যে ছড়ানো আছে, তা ছাড়া, মানব সমস্যার বহু বিভাগের বহু প্রশ্নেরই সমাধান ওতে দেওয়া আছে। চিঠিগুলি বারে বারে পড়লেও তা পুরানো হয় না, যতবারই পড়া যায় ততবারই মনে হয় একটা নতুন দীপ্তি পেলাম। সেই সব চিঠি এখন ছয় খণ্ড পুস্তকে প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু এখনও তা নিঃশেষ হয়নি, আরো অনেক প্রকাশিত হ'তে বাকী আছে। শ্রীঅরবিন্দের অমর সাহিত্যের মধ্যে এই চিঠিগুলির স্থান খুবই উঁচুতে। আর আমাদের দেশের সাধারণ পাঠকদের পক্ষে এই "Letters of Sri Aurobindo" নামক বইগুলি সব চেয়ে সহজপাঠ্য ও সহজবোধ্য হবে।

কেমন ভাবে তাঁকে প্রশ্ন করা হ'ত আর কেমন জবাব তিনি দিতেন, তার কয়েকটি উদাহরণ মোটামুটিভাবে এখানে দেওয়া যাক—

প্রশ্নোত্তর

ভগবান আছেন এ কথা কি সত্য ? উত্তর : "নিশ্চয়, দুই আর দুইএ চার হয় এ-কথা যেমন সত্য, ভগবান আছেন এ-কথা তার চেয়েও বেশি সত্য।"

ভগবানকে কি চোখে দেখার মতো স্পষ্ট ক'রে দেখা যায় ? উত্তর : "হাঁ, ঘরের টেবিল চেয়ারকে যেমন স্পষ্ট দেখা যায়, ভগবানকে তার চেয়েও স্পষ্ট ক'রে দেখা যায়। ঐ সব জিনিস দেখাতে তবু আমাদের কখনো বা চোখের ভুল হ'তে পারে, কিন্তু ভগবানকে দেখতে পেলে সে দেখার কখনো ভুল হয় না। আমরা বাইরে যা কিছু দেখি কিংবা শুনি সে সবই আমাদের ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে। ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ছাড়া আমাদের চেতনা কিছুই টের পায় না, তার কারণ চেতনা রয়েছে অজ্ঞানতার পর্দার আড়ালে, ইন্দ্রিয়ের মারফতে যতটুকু খবর তার কাছে পৌঁছচ্চে ততটুকুই সে জানছে। ভগবানের কৃপা হ'লে সেই পর্দাটি যায় ঘুচে, তখন ভিতরকার চেতনা ভগবানকে সরাসরি দেখতে পায় তার নিজস্ব আভ্যন্তরীণ দৃষ্টি দিয়ে। শুধু তাই নয়, আভ্যন্তরীণ দিব্যদৃষ্টি তখন বাইরের ইন্দ্রিয়কেও সেইভাবে সচেতন ক'রে তোলে, তাই বাইরের দৃষ্টিও ভগবানকে দেখতে পায়।"

ভগবানকে দেখতে পাবার কি উপায় ? উত্তর : "তাঁকে দেখবার জন্য প্রবল আগ্রহ ও আস্পৃহা করতে থাকা চাই। তাঁকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসা, নিজেকে সম্পূর্ণরূপে তাঁর কাছে নিবেদন ক'রে দেওয়া চাই। এই ভাব নিয়ে থাকতে পারলে একদিন নিশ্চয়ই তাঁর দেখা মেলে।"

ভগবানকে পাবার কিছু মন্ত্র আছে? উত্তর: "মন্ত্র শুধু এই, —'আমি একান্তভাবে যখন তাঁকেই চাইছি, তখন তাঁকে পাবোই, এই আমার বিশ্বাস। এর পরে আর কিছুই আমার ভাববার নেই, যা কিছু করবার তিনিই করুন, নিজেরই উপায়ে নিজেরই সময়মত তিনি নিজের হাতে আমাকে তাঁর কাছে টেনে নিন', —এই হ'ল সব চেয়ে সেরা মন্ত্র। তাঁকে আমি পাবোই পাবো, এই বিশ্বাসের মন্ত্রই সব চেয়ে বড়ো মন্ত্র।"

কিন্তু অমন ক'রে চাইলেও যদি ভগবানকে না মেলে? উত্তর: "চাওয়াটি সত্যিকার হ'লে, তার ফল একদিন ফলবেই। এটাই মানুষের জীবনের এক অভ্রান্ত অভিজ্ঞতা যে, গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত জগতের সবাই তোমাকে বঞ্চনা করবে, কেবল ভগবান নয়। একবার যদি তাঁর দিকে ফিরতে পারলে তাহ'লেই তাঁর কাছে পৌঁছবার রাস্তা তোমার পাকা হয়ে গেল, তাতে তার পর যতটাই কেন সময় লাগুক। তুমি যদি নিজের থেকে সে রাস্তায় চলা ছেড়ে দাও তাহ'লে অবশ্য আলাদা কথা, নইলে তিনি তোমায় কিছুতেই ছাড়বেন না, শেষ পর্যন্ত নিশ্চয় টেনে নিয়ে যাবেন। তিনি প্রকৃত প্রার্থীকে কখনো ফেরান না।"

কঠোর তপস্যা ছাড়া কি ভগবানকে পাওয়া সম্ভব? উত্তর: "সবই সম্ভব যদি একান্ত আস্থা ও নির্ভরতা নিয়ে তাঁর হাতে নিজেকে ছেড়ে দিতে পারো। শুধু যদি তোমার মনের সন্দেহের ভাবটা কমিয়ে আনো, দীনভাবে নিজেকে সমর্পণ করবার ইচ্ছাটি বাড়িয়ে যাও, তাহ'লেই ভগবান সে ডাকে সাড়া দেবেন। ওর চেয়ে বেশি তপস্যার দরকার হবে না। ভগবান তাদের কাছেই ধরা দেন

যারা একান্তভাবে তাঁর কাছে ধরা দিতে পারে। তারাই পাবে তাঁর শান্তি, আলো, আনন্দ, শক্তি, জ্ঞান, সব দিক দিয়ে পরিপূর্ণতা।"

আপনি এত ক'রে বললেও তবু কিন্তু মনের সন্দেহ যায় না। উত্তর : "যতক্ষণ নিজের চোখে দেখতে না পাচ্ছ ততক্ষণই তো সন্দেহ। আপাতত যেটুকু বিশ্বাস আছে তাই নিয়েই এগিয়ে যাও। তার পরে শুধু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা নয়, প্রত্যক্ষ অনুভূতির দ্বারা নিজেই তাঁকে দেখবে, তাঁর শান্তি ও আনন্দ তখন বন্যার বেগে তোমার মধ্যে নেমে আসবে, তাঁর সাক্ষাৎ উপস্থিতি অন্তরের মধ্যে স্পষ্টই অহরহ বোধ করতে থাকবে, আর জ্ঞান-দীপ্তির ঢেউগুলি এসে এক মুহূর্তে তোমার ভিতরকার সমস্ত অন্ধকারকে আলোয় আলোয় প্লাবিত ক'রে দেবে ; এইসব প্রত্যক্ষ দেখলে তখন কোথায় থাকবে তোমার সন্দেহ ?"

এ সব কেবল আপনারই নিজের মনের ধারণার কথা, সত্যিকার বিজ্ঞানের কথা তো নয়। উত্তর : "এও একরকম বিজ্ঞান বৈকি। বিজ্ঞানেরও প্রথম সূচনা মনের মধ্যে একটা কিছু অনুভব নিয়ে, তার পরে পরীক্ষা ও নিরীক্ষা দিয়ে সেই অনুভবের সত্যকে বাস্তবে আবিষ্কার করা হয়, তার পরে তাকে কাজে লাগানো হয়। এর বেলাতেও তাই। বিভিন্ন কালে বিভিন্ন দেশের লোক নিজেদের অনুভব থেকে ভগবানের সম্বন্ধে একটাই কথা বলেছে,—তুমি তোমার আপন পরীক্ষা ও নিরীক্ষা দিয়ে সে কথা যাচাই ক'রে দেখ, তার থেকে যে বাস্তব সত্যটি মিলবে তাকে নিজের কাজে লাগাও। আগের থেকে শুধু তর্ক আর সন্দেহ ক'রে লাভ কি ? তাতে কি বিজ্ঞানেরই কোনো মীমাংসা হয় ?

অবিশ্বাসের জিনিসকে নিয়ে কোনো দিক দিয়ে কোনো পরীক্ষাই চলে না।"

ভগবানের কৃপা কি সকলের বেলাতেই? উত্তর: "হাঁ, সকলেই তাঁর কৃপা লাভ করতে পারে, তবে তার আগে তোমার সেই কৃপাকে গ্রহণ করবার যোগ্যতায় গিয়ে ওঠা চাই। তাঁর দিক থেকে আসবে কৃপা, তোমার দিক থেকে জাগবে প্রস্তুতি, তবেই তো সে কৃপা ফলবে।"

আপনি তো ভগবানকে পেয়ে গেছেন, তবে আরো যোগ সাধনা কেন? উত্তর: "আমার এ যোগ আমার নিজের জন্য নয়। নিজের জন্য আমার কিছুই দরকার নেই, এমন কি মুক্তিও না। পৃথিবীর বর্তমান অবস্থাকে বদলাবার জন্যই আমার যোগ, আমি চাই এ জগৎ এখনকার চেয়ে অন্য রকমের হোক।"

পৃথিবীর অবস্থা তো আরো বেশি ঘোরালো হয়েই চলেছে, তবে আর আপনার উদ্দেশ্য সফল হবার সম্ভাবনা কোথায়? উত্তর: "এমন ঘোরালো অবস্থা একদিন আসবেই, আমি জানতাম; ঊষা আসবার ঠিক আগেই রাত্রের অন্ধকার সব চেয়ে গাঢ় হয়ে ওঠে। এই সব গ্লানি জগৎ প্রকৃতির মধ্যে জমা করা ছিল, সেগুলো সব বাইরে বেরিয়ে না গেলে প্রকৃত জগৎ-কল্যাণ আসবে কেমন করে? বাইরের দিকে এখনই কিছু অদলবদল এসে গেছে, এবার ভিতরের দিকেও আসবে। ভারত স্বাধীন হয়ে গেছে, যদিও তার সব গণ্ডগোল এখনও ঘোচেনি। এও একদিন ঘুচবে, যদিও লোকের এখনও কিছু দুর্ভোগ ভোগ করতে হবে, কিন্তু তা অপরিহার্য। তার পরেই শুরু হবে দিব্যশক্তির ক্রিয়া, জগৎকে আধ্যাত্মিক আলোয়

আলোকিত করবার সংকল্প তখনই হবে সফল। তাই এখনকার এই ঘোরালো অবস্থা দেখে আমি একটুও হতাশ হচ্ছি না, জগতের কল্যাণ আনতে পারা সম্বন্ধে আমার একটুও সন্দেহ নেই।”

এই শেষ চিঠিখানি তিনি লিখেছিলেন দেহত্যাগের প্রায় আট মাস আগে। কিন্তু একাদিক্রমে পুরো দশটি বছর ধরে অনবরত চিঠি লিখে তিনি হঠাৎ চিঠি লেখা বন্ধ ক'রে দিলেন। তার পর ক্বচিৎ দু' একখানা চিঠির জবাব দিতেন, যেমন ঐ শেষের চিঠিখানি। কিন্তু পূর্বেকার দশটি বছরই ছিল তাঁর চিঠি লেখার যুগ।

এ লেখা থামল কেন ?

অতঃপর তিনি বললেন, অন্যরকম কাজের চাপ অত্যন্ত বেড়ে গেছে, চিঠি লেখার আর সময় হচ্ছে না। নিজেদের নানারকম প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার প্রয়োজন হয়তো তখনও অনেকেরই ছিল, কিন্তু তখন তিনি তাঁর কাজের অন্য স্তরে গিয়ে পড়েছেন। এমনিই তাঁর প্রকৃতির এক বিশিষ্ট ধারা,—আগাগোড়াই তা দেখতে পাওয়া গেছে। একটা নূতন কাজের স্তরে এসে তিনি প্রথম চাকা ঘোরাতে শুরু করেন, তার পরে যেমনি চাকাটা ভালো ক'রে ঘুরতে শুরু করল অমনি সেখানকার কাজ ছেড়ে দিয়ে তিনি চলে যান তার চেয়ে উপরকার অন্য এক স্তরে। বরাবরই এইরকম। প্রথম হ'ল বিদ্যা অর্জনের কাজ। বিলাত থেকে বিদ্যা অর্জন ক'রে এসে তিনি শুরু করলেন বিদ্যাদানের কাজ, কিছুকাল বরোদায়, তার পরে কলকাতায় ন্যাশন্যাল কলেজে। হঠাৎ একদিন এ কাজ থেকে একেবারেই সরে তিনি পুরোমাত্রায় নেমে গেলেন দেশোদ্ধারের কাজে। তার জন্য, বিপ্লবী দল গড়া,

বক্তৃতা করা, পত্রিকা সম্পাদন করা, জেলে যাওয়া প্রভৃতি কোনো কিছুই বাদ গেল না। তার পর দেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের চাকা যখন বেশ ঘুরতে শুরু করেছে, তখন তিনি হঠাৎ ঐ কাজ ছেড়ে দিয়ে সে ক্ষেত্র থেকে একেবারেই সরে চলে গেলেন যোগ সাধনার কাজে। যখন সিদ্ধিলাভ করলেন, তখন থেকে কিছুকাল পর্যন্ত চলল লেখার পালা। ঐ সময়ের মধ্যে তাঁর বড়ো বড়ো গ্রন্থগুলি লিখলেন, চিঠিও লিখলেন বিস্তর। তার পরে আবার যখন সাধনার কোনো উত্তুঙ্গ পর্বতচূড়ায় ওঠার দরকার পড়ল, তখন তিনি লেখালেখির স্তর থেকেও তেমনিভাবেই সরে গেলেন। অবশেষে এবার তাঁকে ওর চেয়েও উপরের কোনো স্তরে উঠে যেতে হয়েছে, তা আমাদের পার্থিব জীবনের সীমানার বাইরে, সেখানকার কাজের সম্বন্ধে আমরা আজ পর্যন্ত কোনো কিছুই জানি না। সুতরাং এমন প্রকৃতির মানুষটি কখন কি বুঝে নিজের কাজের ধারা বদলাচ্ছেন সে সম্বন্ধে আমাদের বলবার কোনো ক্ষমতাই নেই। মাত্র এইটুকু বলতে পারি যে, জগতের মঙ্গলের জন্যই পর্বে পর্বে তিনি নতুনকে অর্জন আর পুরানোকে বর্জন ক'রে চলেছেন।

যোগশক্তি

শ্রীঅরবিন্দের যে অপূর্ব একটা যোগশক্তি ছিল তারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে সে শক্তিকে তিনি যখন তখন প্রয়োগ করতেন না, কিংবা লোকে তার আশ্চর্য ফল দেখুক এটাও তিনি চাইতেন না। তিনি বলতেন যে, নিতান্ত দরকার না পড়লে সে শক্তিকে ব্যবহার করতে নেই, তাতে প্রকৃতির কাজে বিশৃঙ্খলা ঘটে

যায়। তবে কাউকে রোগের কষ্ট থেকে বাঁচাবার দরকার হ'লে কিংবা কোনো দেশকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে হ'লে তখন এ শক্তি অবশ্যই প্রয়োগ করা যেতে পারে। তাই মাঝে মাঝে প্রয়োজন বুঝলে নিজের যোগশক্তিকে তিনি গোপনে গোপনে প্রয়োগ ক'রে থাকতেন। এর দ্বারা কত লোককে যে তিনি রোগের যন্ত্রণা ও নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছেন তার কোনো সংখ্যা নেই। সে সকল কথা সাধারণের কাছে প্রকাশ হয়নি বটে, কিন্তু অনেকেই তা ব্যক্তিগতভাবে জানে ও প্রমাণ দিতে পারে।

১৯৩৫ সালে (ভারত স্বাধীন হবার বারো বছর আগে) শ্রীনীরদ-বরণ একবার প্রশ্ন করেছিলেন—ভারত এখনও তো পরাধীন রইল, আপনি কেন দেশকে স্বাধীন করতে নিজের যোগশক্তি প্রয়োগ করছেন না? তার জবাবে তিনি লেখেন—"আমি তো বলেই রেখেছি, ভারত এবার আপনা থেকেই স্বাধীন হবে, কোনো সন্দেহ নেই। যেটা স্থির হয়ে গেছে তার জন্য আবার মাথা ঘামাতে যাব কেন? স্বাধীনতা পাবার পরে দেশ কেমনভাবে যে তার সদ্ব্যবহার করবে, সেই কথাই এখনও জানা নেই, বরং তার জন্যই এখন কিছু মাথা ঘামানো দরকার।"

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হিটলারের দাপটে ইংলণ্ডের যে কি অবস্থা এসেছিল সে কথা সকলেই জানে। ডান্‌কার্কে মারাত্মকভাবে পরাজিত হবার পর ইংলণ্ডের তখন যায় যায় অবস্থা, হিটলার বললে ইংলণ্ডের রাজপ্রাসাদে চড়াও হয়ে বসে সে ডিনার খাবে, তার তারিখ পর্যন্ত দেওয়া রইল ১৫ই আগষ্ট (ঠিক শ্রীঅরবিন্দেরই জন্মদিনে!)। ঐ সময়ে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর যোগশক্তি প্রয়োগ করেছিলেন। নিজেই

তিনি সে কথা বলেছেন। তার ফলেই বল, কিংবা যে-কোনো কারণেই বল, যুদ্ধের অবস্থার যে হঠাৎ মোড় ফিরে গেল এ কথাও সকলে জানে। আবার জাপান যখন ভারতকে আক্রমণ করবে ব'লে স্থির করেছিল, তখনও তিনি তাঁর যোগশক্তি প্রয়োগ করেছিলেন। দেশের পর দেশ জয় ক'রে আসতে আসতে হঠাৎ যুদ্ধের অবস্থার মোড় ঘুরে গিয়ে শেষ পযন্ত জাপানের কি দুর্দশা ঘটল সে কথাও সকলে জানে। এই সকল ব্যাপারে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তিকে প্রয়োগ করেছিলেন, যাতে আসুরিক ও অশুভ শক্তির প্রাধান্য জগতে না এসে পড়ে।

স্বাধীনতা দিবস

অবশেষে শ্রীঅরবিন্দের জীবনব্যাপী ঐকান্তিক কামনা সফল হ'ল, তাঁর জীবদ্দশাতেই ভারত স্বাধীন হ'ল,—শুধু তাই নয়, কোনো এক অদ্ভুত যোগাযোগে ঠিক তাঁরই জন্মদিনে ভারতের স্বাধীনতার দিনটি ধার্য হয়ে গেল। ১৯৪৭ সালে ১৫ই আগষ্ট তারিখেই ভারত স্বাধীন হচ্ছে, এই কথা শুনে তিনি যেন একটু ব্যঙ্গ ক'রেই তখন বললেন—"ভগবানের এটি হ'ল আমাকে আমার জন্মদিনের উপহার দেওয়া, কিন্তু তবুও তিনি উপহারটি গোটা অবস্থাতে দিতে পারলেন না, ভারতের স্বাধীনতাকে দুই টুকরো ক'রে ছিঁড়ে দিলেন।"

সেই তারিখে ভারতের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে তিনি একটি বাণী দিয়েছিলেন। তাঁর সেই কথাগুলি আমাদের প্রত্যেকেরই মনে চিরস্মরণীয় ক'রে রাখা উচিত। তাতে যে কথা তিনি বলেছিলেন তার সার অংশগুলি মাত্র এখানে উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি—

"...আমার জন্মদিনে হ'ল ভারতের স্বাধীনতার জন্মদিন, একে আমি ভগবানের বিশেষ আশীর্বাদ ব'লেই মনে করি, তিনি যে আমার সারাজীবনের প্রচেষ্টাকে সমর্থন করেছেন তারই এটি চিহ্ন।...

"আমার জীবনে আমি যা কিছুই আশা ক'রে এসেছি, একে একে প্রায় তার সবগুলিই সফল হয়েছে কিংবা হ'তে চলেছে। আগের দিনে সেইসব স্বপ্নকে অসম্ভব মনে হ'তে পারত, কিন্তু এখন আর তা স্বপ্ন নয়।...

"আমার প্রথম স্বপ্নটি ছিল, এই বহুভেদযুক্ত ভারতের মধ্যে ঐক্যভাব এনে ব্যাপক বিপ্লবের সৃষ্টি করা ও ভারতকে স্বাধীন করা। সে স্বপ্ন এখন ফলে গেছে।...

"আমার দ্বিতীয় স্বপ্ন, সমগ্র এশিয়াতেই মুক্তির জাগরণ আসবে, আর এই এশিয়া সমগ্র জগতের উন্নতির কাজে বিশেষ একটা অংশগ্রহণ করবে। এই স্বপ্নটিও এখন সফল হবার পথে চলেছে।...

"তৃতীয় স্বপ্ন, জগতের সকল জাতির সকল মানুষদের নিয়ে এক বিশ্বমিলন ঘটবে, যার ফলে সব মানুষই এক হয়ে যাবে, আর এই মানবজাতির আরো উন্নতি হবে। এতে বিস্তর বাধা থাকলেও এই মহামিলনের কাজ ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে, পথ আগের চেয়ে অনেকটা প্রশস্ত হয়েছে।...

"চতুর্থ স্বপ্ন, স্বাধীন ভারত সমগ্র জগৎকে দান করবে তার অমূল্য আধ্যাত্মিক শিক্ষাগুলি, আধ্যাত্মিকের পথে জীবনকে যে কেমন ক'রে উঁচু ক'রে তুলতে হয় তারই উপায় জগৎবাসীকে সে শিখিয়ে দেবে। ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি অঞ্চলে এ-কাজটিও ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে, ক্রমে তা আরো অনেক বেড়ে যাবে।...

"আমার শেষ স্বপ্ন, সমস্ত মানবজাতি বিবর্তনের যাত্রাপথে আরো এক ধাপ এগিয়ে যাবে, এখনকার চেয়ে তারা চেতনার আরো এক স্তর উঁচুতে গিয়ে উঠবে। মানুষের জীবনের যে-সব জটিল প্রশ্নের মীমাংসা আজ পর্যন্ত করতে পারা যায়নি, সেই সব প্রশ্নের মীমাংসা এবার খুবই সহজ হয়ে যাবে।

এ যদিও এখনও আমার ব্যক্তিগত প্রত্যাশা, কিন্তু আমি ছাড়া আরো কেউ কেউ এমন কথা ভাবতে শুরু করেছে। এতেও বাধা আছে যথেষ্ট, কিন্তু জয় করবার আনন্দ দিতেই তো এইসব বাধার সৃষ্টি। মহাশক্তির ইচ্ছা হ'লে এও একদিন নিশ্চয় হবে, আর এ বিষয়ের প্রথম প্রেরণা আসবে ভারতের দিক থেকেই। সারা বিশ্ব হবে এর ক্রিয়ার ক্ষেত্র, কিন্তু ভারত হবে তার মূল কেন্দ্র।...

"ভারতের মুক্তির দিনে এই স্বপ্নগুলির কথাই আমি সকলকে জানিয়ে দিলাম। আমার এই আশাগুলি সার্থক হবে কিনা আর কতদিনে হবে, তা সম্পূর্ণই নির্ভর করছে এই নবজীবনপ্রাপ্ত স্বাধীন ভারতের উপর।"

"সাবিত্রী"

জীবনের শেষের দিকে অন্য সব রকমের লেখা বন্ধ ক'রে দিলেও তাঁর "সাবিত্রী" মহাকাব্যটি লেখা তিনি প্রায় শেষ পর্যন্তই চালিয়ে গেছেন। এক হিসাবে বলতে গেলে এই মহাকাব্যটিই তাঁর প্রথম জীবনের প্রথম রচনা, আবার তাঁর শেষ জীবনের শেষ রচনা। প্রথম যৌবনে বরোদায় থাকতেই তিনি এই কাব্যটি লিখতে শুরু করেন। প্রথম দিকটাতে খুব অল্পই লিখতেন, তার মধ্যে বিস্তর কাটাকুটি করতেন, আবার কিছুকাল সে লেখা ফেলেই রাখতেন। মাঝে স্বদেশী আন্দোলনের যুগে এ লেখা প্রায় বন্ধই ছিল। পণ্ডিচেরীতে আবার এই কাব্য লিখতে শুরু করেন। তাড়াতাড়ি তখন অনেকটা লিখে ফেলেন, আর আগেকার প্রায় সমস্তটাই কেটেকুটে আগাগোড়া লেখেন নতুন ক'রে। এমনিভাবে লিখে দেহত্যাগের মাত্র কয়েকদিন আগে এর শেষ অধ্যায়টি সম্পূর্ণ ক'রে তার পর থেকে আর কোনো কিছুই তিনি লেখেননি। যেন এখান থেকে চলে যাবার কথা

জানতে পেরেই তিনি তাড়াতাড়ি শেষ অধ্যায়টি লিখে ফেললেন, এবং যেদিন লেখা শেষ হ'ল সেদিন একটু হেসে একটি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

প্রায় পঞ্চাশ হাজার লাইনের লেখা এই মহাকাব্যটি তাঁর এক সম্পূর্ণ নতুন ধরনের সৃষ্টি। এর ছত্রে ছত্রে তাঁর কবিহৃদয়ের সৌন্দর্য ও দিব্য আনন্দের এক বিশেষরকম স্পর্শ পাওয়া যায়, যা স্বর্গীয় পারিজাতের মতোই কোমল ও সৌরভপূর্ণ, আর যতবারই পড়া যায় ততবারই সেই তাজা সৌরভটি নূতন ক'রে এসে পাঠকের মনকে ভরে দেয়। মনে হয় তাঁরই অনুভূতি যেন আমার ভিতরকার ঘুমন্ত অনুভূতিকে বারে বারে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে দিচ্ছে। যাঁরা ইংরেজী কাব্য পড়েন এবং বোঝেন তাঁরা বলেন যে, এমন মহাকাব্য ইংরেজী ভাষাতে কখনো কেউ লেখেনি। কিন্তু শুধু কাব্য হিসাবেই এর দাম নয়, এর মধ্যে শ্রীঅরবিন্দের সমস্ত আশা ও আদর্শের কথা, তাঁর মহান আস্পৃহার কথা, জগতের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা, সমস্তই কাব্যের ছন্দে গাঁথা হয়ে এর পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে। তাঁর যা-কিছু ভবিষ্যদ্বাণী, এর মধ্যেই তিনি অকৃপণভাবে ব্যক্ত ক'রে গেছেন। এর মধ্যে তিনি জোর দিয়ে ব'লে গেছেন যে, এই হাসি-কান্নায় নিত্যজীবন্ত জগতের কখনই ধ্বংস হ'তে পারে না, বেঁচে থাকবার জন্যই এ-জগৎ জন্মেছে, বেঁচে থেকে এই জগৎ ক্রমশই যেমন এতখানি ফুটে উঠেছে তেমনি ক্রমশই আরো বেশি ক'রে ফুটবে। আর এক আশ্চর্যের কথা এই যে, মায়ের আবির্ভাব সম্বন্ধে এ কাব্যে তিনি আগের থেকেই লিখে রেখেছিলেন। এর মধ্যে মা-ই হলেন সাবিত্রী, তাঁকে নিয়ে গোড়া থেকেই এই কাব্যের

রচনা। তিনি লিখেছিলেন যে, সাবিত্রী এলেন মরা সত্যবানদের বাঁচাতে, আপন তপের জোরে তাদের তিনি বাঁচিয়ে তুললেন।

"সাবিত্রী" কাব্যটি আগাগোড়াই রূপক। যদিও সাবিত্রী ও সত্যবানের পৌরাণিক কাহিনীকে অবলম্বন ক'রে এটি রচিত হয়েছে, কিন্তু রূপকের ভিতর দিয়ে এর গভীর অর্থ দাঁড়িয়ে গেছে অন্যরকম। সাবিত্রীর পিতা রাজা অশ্বপতি আঠার বছর যাবৎ কঠোর তপস্যা ক'রে জগন্মাতা সাবিত্রীকে তাঁর গৃহে কন্যারূপে আবির্ভূতা করলেন। রূপক হিসাবে এই কাহিনীর প্রতি ছত্রে অশ্বপতির সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের নিজের ও সাবিত্রীর সঙ্গে শ্রীমায়ের মিল রয়েছে। এখানে এসে সাবিত্রীর প্রধান কাজ হ'ল মৃতপ্রায় সত্যবানকে অর্থাৎ মৃতপ্রায় মানবজাতিকে যমের হাত থেকে ছিনিয়ে এনে নবজন্ম দান করা। এ-কাজ তিনি একাই পারবেন। তার পরে তারা এমন এক সত্যযুগের আলোকরাজ্যের অধিকারী হবে যেখানে সূর্য কখনই অস্ত যায় না।

এই বিরাট মহাকাব্য মোট বারোটি খণ্ডে সম্পূর্ণ। সবগুলি খণ্ডই লেখা শেষ হয়েছিল, কেবল মৃত্যু সম্পর্কীয় অধ্যায়টি আর উপসংহারটি লেখা হয়নি। তাঁর রচনার লিপিকার শ্রীনীরদবরণ যখন বলেন যে, এই অধ্যায় দুটি লিখতে বাকী রয়েছে, তখন তিনি হেসে বলেন, ও পরে দেখা যাবে। কবে কখন সেই অধ্যায় দুটি আবার লিখিত হবে তা কে জানে?

মহাপ্রস্থান

কিছুকাল থেকে শ্রীঅরবিন্দের শরীরযন্ত্র বিকল হচ্ছিল। এই দেখে ডাক্তারেরা উদ্বিগ্ন হচ্ছিলেন, তাঁরা ওষুধপত্র ব্যবহারের কথা বলছিলেন। কিন্তু বিগত চল্লিশ বছর যাবৎ শ্রীঅরবিন্দের শরীরে এক ফোঁটাও ওষুধ প্রবেশ করেনি। তিনি বললেন, দেখ না আপনিই এটা সেরে যাবে। বাস্তবিক তা কিছুদিন পরে আপনিই যেন সেরে গেল। দেহত্যাগের প্রায় দুই মাস আগে তিনি হঠাৎ একদিন বললেন, "সাবিত্রী লেখাটি এবার কিন্তু তাড়াতাড়ি সেরে ফেলা চাই।" তার পর খুব তাড়াতাড়ি তাঁর সেই রচনা শেষ করলেন।

"সাবিত্রী" লেখার কাজও শেষ হ'ল, আর তখন থেকেই আবার সেই রোগলক্ষণগুলো নতুন ক'রে দেখা দিতে শুরু করল। ১৯৫০ সালের ২৪শে নভেম্বরের দর্শন দিবসে সকলকে দর্শন দেবার অনুষ্ঠানটি শেষ হবার পরেই রোগটা হঠাৎ বেড়ে গেল। সকলেই তখন ব্যস্ত হয়ে উঠল, টেলিগ্রাম ক'রে কলকাতা থেকে সার্জনকে নিয়ে যাওয়া হ'ল, কিন্তু অপারেশনে শ্রীঅরবিন্দ রাজী হ'লেন না। অথচ এবার রোগের লক্ষণ ক্রমশ বেড়েই চলেছে। সেবক ভক্তেরা তাঁকে বার বার জিজ্ঞাসা করতে লাগল, "রোগ সারাবার জন্য আপনি নিজের যোগশক্তি কেন প্রয়োগ করছেন না?" এ-কথারও কোনো জবাব মেলে না। মা কেবল একটু হেসে বলেছিলেন, "আমরা পরের রোগই সারাই, নিজেদের নয়।"

দেহত্যাগের আগের সন্ধ্যায় হঠাৎ তিনি বেশ সুস্থ হয়ে চেয়ারে উঠে বসলেন। আবার তখন জিজ্ঞাসা করা হ'ল, "যোগশক্তি

প্রয়োগ করছেন না ?" এবার তিনি উত্তর দিলেন, "না"। "কেন করছেন না ?" তিনি উত্তর দিলেন, "বোঝাতে পারব না, তোমরা বুঝবে না।" এই তাঁর শেষ কথা, এর পরে আর কোনো কথা তিনি বলেননি।

মহাপুরুষেরা বোধ হয় ইচ্ছা করেই কষ্টদায়ক রোগে ভুগে যন্ত্রণা-দায়ক মৃত্যুকে বরণ ক'রে নেন, যাতে সাধারণ মানুষের মৃত্যুকালের যন্ত্রণাগুলো তাঁদের এড়িয়ে যাওয়া না হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা। বলা যেতে পারে মহর্ষি রমণের কথা।

অবশেষে যেন ইচ্ছা ক'রেই মৃত্যুর হাতে তিনি আপন দেহটিকে বিনা বাধায় সমর্পণ করলেন। কিছুক্ষণ পরেই রোগ আবার বেড়ে উঠল, মধ্যরাত্রের পরে ৫ই ডিসেম্বর তিনি দেহত্যাগ করলেন।

মহাসমাধি

দেহত্যাগের পরেও কিন্তু তাঁর মৃতদেহে কোনো মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশ পায়নি। দেখা গেল যে, তখনও মুখচোখ দিয়ে অসাধারণ জ্যোতি বেরোচ্ছে, যেন এইমাত্র চোখ দুটি বুজে তিনি শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছেন। ডাক্তারেরা পর্যন্ত তাঁর মৃতদেহের এই অদ্ভুত জ্যোতি দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। মা বললেন, "ওটি অতিমানসের জ্যোতি। যতদিন এই জ্যোতি অম্লান থাকবে ততদিন এ দেহের সৎকার করা হবে না।" পাঁচ দিন যাবৎ সেই জ্যোতি তেমনি অম্লান হয়ে রইল, তার পরে মুখের চেহারায় দেখা দিল মৃত্যুর মলিনতা। মা তখন দেহকে সমাধিস্থ করতে বললেন।

আশ্রমের মধ্যে একটি গাছতলায় শ্রীঅরবিন্দের সমাধি রচিত হয়েছে। তার উপরে প্রত্যহ অজস্র টাটকা ফুল বিছিয়ে দেওয়া হয়। পৃথিবীর নানা দেশ থেকে দলে দলে লোক আসে, সেই সমাধির কাছে গিয়ে তাদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করতে। সেই সমুদ্রতীরস্থ অখ্যাতনামা ক্ষুদ্র শহর পণ্ডিচেরীর ঐ নির্দিষ্ট স্থানটি এখন সারা জগতের এক মহাতীর্থ। সমাধিগাত্রে এই কথাগুলি লেখা আছে—

"মরদেহে তুমি ছিলে আমাদের প্রভু, আমাদের পরমতম গুরু, নাও তুমি আমাদের হৃদয়ের অসীম কৃতজ্ঞতাপূর্ণ শ্রদ্ধাঞ্জলি। আমাদের জন্য তুমি অনেক করেছ, অনেক লড়েছ, অনেক সয়েছ,—আমাদের জন্য করেছ অনেক আস্পৃহা, অনেক সাধনা, সুলভ ক'রে এনেছ সাধনার সিদ্ধি। তোমার কাছে জানাই আমাদের প্রণতি। আর এই প্রার্থনা করি যেন তোমাকে আমরা কখনই না ভুলি, তোমার কাছে আমরা যে কতটা ঋণী তা যেন সর্বদাই আমাদের স্মরণ থাকে।"

তার পরেও তিনি আছেন

মা বলেন, এখনও তিনি আমাদের মধ্যে সর্বক্ষণ উপস্থিত রয়েছেন। তিনি নিজেই অশরীরী বাণীতে মাকে শুনিয়ে দিয়েছেন যে, এখনও তিনি রইলেন। যতদিন পর্যন্ত তাঁর অভিপ্রেত কাজটি সফল না হয়,—যতদিন পর্যন্ত জগতের সত্য রূপান্তর না আসে, ততদিন পর্যন্ত তিনি এই মরজগতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কিছুতে ছাড়বেন না, সক্রিয় ও সম্পূর্ণভাবেই সূক্ষ্মদেহে এখানে থাকবেন।

দেহত্যাগের এক বছর আগেও মায়ের সঙ্গে এই নিয়ে তাঁর কথা হয়েছিল। তখন তিনি বলেছিলেন যে, পৃথিবীর রূপান্তর আনবার জন্য দরকার হ'লে তিনি দেহত্যাগ ক'রে অদৃশ্যভাবে অবস্থান করবেন, মাকে একাই এখানে তখন থাকতে হবে, অতিমানস যোগের কাজটি এখানকার স্তরে সুসম্পন্ন ক'রে তোলবার জন্য। আবার শ্রীঅরবিন্দের দেহত্যাগের পরেও মা তাঁর কাছ থেকে সেই কথারই পুনরুক্তি শুনলেন।

শ্রীঅরবিন্দ বিশ্বশিক্ষা কেন্দ্র

ভারতীয় আদর্শ অনুযায়ী একটি বিশ্বশিক্ষার কেন্দ্র পণ্ডিচেরীতে গড়ে উঠুক, এ-সংকল্প শ্রীঅরবিন্দের মনে অনেককাল থেকেই ছিল। সে এমন একটি আন্তর্জাতিক মিলনস্থান হবে যা কোনো বিশেষ জাতিরই নিজস্ব অধিকারভুক্ত নয়, সকল দেশের সকল জাতির মানুষই সেখানে আপন আপন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বজায় রেখে স্বচ্ছন্দে স্বাধীনভাবে থেকে এখানকার যা কিছু শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে, কিন্তু কারো সঙ্গে কারো বিরোধ থাকবে না, সকলেরই একমাত্র লক্ষ্য হবে শিক্ষার দ্বারা নিজেদের আত্মার উন্নতিসাধন করা। এই ধরনের বিশ্বশিক্ষার কেন্দ্র কেমনভাবে গড়ে তোলা যায় তাই নিয়ে তিনি চিন্তা করতেন। মাও ইতিপূর্বে আশ্রমের নানা-জাতীয় ছেলেমেয়েদের নিয়ে এই ধরনের একটি পাঠশালা স্থাপন করেছিলেন, সেখানে নিজেই তিনি শিক্ষা দিতেন এবং এখনও দেন। শ্রীঅরবিন্দের দেহত্যাগের পর তিনি তার থেকেই ক্রমে শ্রীঅরবিন্দের আদর্শের অনুযায়ী এক বিশ্বকেন্দ্র গড়ে তুলেছেন। সেই

বিশ্ববিদ্যালয় অবশ্য মূল আশ্রম থেকে স্বতন্ত্র, শিক্ষা দেওয়াই সেখানকার লক্ষ্য। কিন্তু তার ভিত্তিতে রয়েছে আধ্যাত্মিক শিক্ষা, মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতিই তার কাম্য, অর্থোপার্জন বা কোনো স্বার্থসিদ্ধি নয়। মা বলেন, এখানে সকলকেই আপন আপন সত্তার সহজ ও পূর্ণাঙ্গ পরিণতি আনবার সমস্ত সুযোগই দেওয়া হয়েছে, যাতে কারোই প্রকৃত জ্ঞানলাভে কোনো বিপত্তি না থাকতে পারে। বলাবাহুল্য এখানকার শিক্ষাবিধিও সাধারণ শিক্ষাবিধি থেকে একেবারে স্বতন্ত্র, তা শ্রীঅরবিন্দের আদর্শে পরিকল্পিত ও মায়ের নির্দেশে পরিচালিত। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রমশই অতি দ্রুত উন্নতি হয়ে চলেছে।

ভারত ও বাংলার ভবিষ্যৎ

মনুষ্যজগতের এবার ধ্বংস হয়ে যাবে, আণবিক যুদ্ধে জগতে সকল দেশ ছারখার হয়ে যাবে,—এমন সব কথা অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তির কাছে শুনে আমরা ভয় পাই ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হই, কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ কোনোদিনই এমন ভয়ের কথা বলেননি। বর্তমান জাগতিক পরিস্থিতির নানা গণ্ডগোল ও বিপর্যয়ের সম্বন্ধে তিনি কেবল এই কথাই বলেছেন যে, এগুলি আসন্ন সূর্যোদয়ের পূর্বলক্ষণ, আলো ফোটার আগেকার শেষ অন্ধকার। বরাবরই তিনি ব'লে এসেছেন যে, এবার আলোর যুগ আসছে, মানুষ এবার তার বিবর্তনের আরো এক ধাপ উপরে উঠবে। বরাবর তিনি ভবিষ্যতের আনন্দের ও আশার কথাই জোর দিয়ে বলেছেন, হতাশার কথা কখনই না। তিনি বলেছেন মানুষের জ্ঞান ও চেতনা এর চেয়ে আরো বেশি

ফুটবে এবং তা অবশ্যম্ভাবী। জগতের মানুষকে বাঁচাবার জন্য শ্রীঅরবিন্দের কথাই শেষপর্যন্ত শুনতে হবে, সকল জাতির সকল মানুষকে এবার সম্মিলিত এক জাতিতে ঐক্যবদ্ধ হ'তে হবে। আর তাঁরই প্রদর্শিত উপায়ে তা সম্ভব হবে। স্বার্থের মন নিয়ে রাজ্যের সঙ্গে রাজ্যের জোড়াতাড়া দেওয়া মৌখিক মিতালি কখনো স্থায়ী হয় না, যতদিন পর্যন্ত মনের মধ্যে একটা ছোট-বড়ো বা আপন-পর ভাব থাকে। আগে সকলের মনের বদল হওয়া দরকার। তার একমাত্র উপায় ভগবানকে জানা। তাঁকে জানলেই তোমরা নিজেদেরও জানবে, তোমরা কেউ যে আলাদা নও এই সত্যের উপলব্ধি আসবে। জগতের মানুষ বস্তুতান্ত্রিক স্বার্থবুদ্ধির জীবন নিয়ে চিরকাল চালিয়ে যেতে পারে না। বাঁচতে হ'লে তাকে এর চেয়ে শ্রেয়তর আধ্যাত্মিক জীবন বরণ করতেই হবে। আধ্যাত্মিক জ্ঞানই সবচেয়ে বড়ো জ্ঞান, তার চেয়ে বড়ো আর কিছু নেই। যোগের দ্বারাই সে জ্ঞান আসতে পারে, আর ভারতই সে বিষয়ে শিক্ষা দিতে পারে। ভারতই শেখাতে পারে যে, বাইরের কাজ বাইরে করলেও ভিতরে কেমন ক'রে আধ্যাত্মিক কাজ করা যায়। তাই সারা পৃথিবীর লোক এখন ভারতের শিক্ষার দিকে ঝুঁকছে। এবার ভারতই হবে এ বিষয়ে সকলের গুরু। ভারতের ভবিষ্যৎ তাই খুবই উজ্জ্বল। ভারতই জগতের সকল মানুষকে বাঁচিয়ে দেবে, তাদের মধ্যে সত্যিকার মিলন ও শান্তি এনে দেবে।

আর বাংলাদেশ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন, "আমি চাই আমার মাকে শ্রেষ্ঠ করতে—সে আমার বাংলা মা। বাঙালী সর্বশ্রেষ্ঠ হয় এ আমার মনোগত কামনা।" তাঁর এ ইচ্ছাটিও ব্যর্থ হবে

না। তিনি যে এই বাংলাদেশে জন্মেছিলেন, তাতেই এ দেশ কালের ইতিহাসে অমর হয়ে রইল। জগতের লোক যুগ যুগ ধরে এই কথাই বলবে যে, বর্ত্তমান জগতের গুরু শ্রীঅরবিন্দ জন্মেছিলেন, এই গঙ্গানদী প্রবাহিত নরম মাটির বাংলাদেশে।